প্রথম সংস্করণ ঃ বইমেলা ১৯৬০

প্রচ্ছদ ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী

অলংকরণ রবীন দাস

জয়দেব ঘোষ কর্তৃক ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং
নবজীবন প্রেস ৬৬ গ্রে স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত
ফটোসেটিং
ইস্ট ইণ্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

সম্ভবত দুই বাংলার কবিদের নিয়ে এইরকম ব্যাপক কবিতার সংকলন এর আগে কখনো বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। খুবই দুরূহ কাজ এবং পরিশ্রম সাধ্য ত' বটেই। সেই কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে পারার জন্য সম্পাদকদ্বয়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের ব্যস্ততার মধ্য থেকে সময় বার করে সম্পূর্ণ সংকলনের একটি সুষ্ঠ প্রকাশনা করতে সাহায্য করেছেন। এটা আমার কাছে নিশ্চয়ই এক মস্ত পাওয়া।

আশা করি বাংলা সাহিত্যে 'দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা' একটি অমূল্য সংযোজন হয়ে থাকবে। এই সংকলনকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য সমরেন্দ্র দাস, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, দেবী রায় এবং দেবব্রত মল্লিক এঁদের প্রত্যেকের অবদান অনস্বীকার্য।

জয়দেব ঘোষ

সম্পাদকীয়

সিলেটে একটা প্রবাদ আছে, 'পানি কাটিলে দুই ভাগ হয় না।' পাশাপাশি দুই দেশে একই বাতাস বয়, এপারের মেঘ ওপারে গিয়ে বর্ষণ করে আসে। দু'দেশেই সুন্দরবন, দু'দেশের আকাশেই এক জাতের পাখি। এসব তো জানা কথা। কিন্তু সীমান্তের এক দিকের মানুষের বিপদে-আপদে কী অন্যদিকের মানুষ ব্যথিত-বিচলিত হবে চিরকাল? মুখের ভাষায় মিল আছে বলেই কি অন্তরের যোগাযোগ কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হবে না? প্রকৃতি সম্পর্কে যত নিশ্চিন্ত উক্তি করা যায়, মানুষ সম্পর্কে তা যায় না। রাজনৈতিক কারণে বঙ্গভাষী রাজ্যটি দ্বিখণ্ড হয়েছে। বাঙালীরা এখন দুটি আলাদা রাজ্যের নাগরিক, এটা একটা বাস্তব সত্য। সেই রাজনীতি কখনো দু'দেশের মধ্যে দূরত্ব অনেক বাড়িয়ে দেবে কি না, মাঝখানের প্রাচীর হঠাৎ আরও উঁচু ও দুর্ভেদ্য হবে কিনা, তা কে জানে? আমরা দুরন্ত আশাবাদী হতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই।

পাকিস্তানী আমলে দু'দিকের বাঙালীদের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির যোগাযোগ বন্ধ করে দেবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, তা যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায় না। সাহিত্য সংস্কৃতির মিল এখনো অনেকটাই অটুট থাকলেও পারস্পরিক বিনিময় স্বাভাবিক নয়। দু'দেশের বই, পত্র-পত্রিকা, ফিল্ম, থিয়েটার, সঙ্গীত, চিত্রকলা সমানভাবে পাওয়া বা উপভোগ করার সুযোগ নেই সব মানুষের। পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু বই-পত্র বাংলাদেশের মানুষকে কিনতে হয় অত্যধিক অতিরিক্ত মূল্যে, পশ্চিমবাংলার মানুষ বাংলাদেশের নাটক ও গানের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকলেও ছিটেফোঁটা মাত্র পায় সরকারি সৌজন্যের নিয়ম রক্ষায়। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের লেখক-লেখিকারা অনেকেই পশ্চিমবাংলায় পাঠকদের কাছে পরিচিত নন, আবার পশ্চিমবাংলায় এই ধারণা ক্রমশই বাড়ছে যে, সারা বিশ্বে বাংলাভাষার সম্মানজনক স্থান প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অনেকখানিই বাংলাদেশের।

সৌভাগ্যের বিষয়, সীমান্তের দু-দিকের সাহিত্যের ভাষা এখনো রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরী-নজরুল-জীবনানন্দ-সৈয়দ মুজতবা আলী অনুসৃত একই বাংলাভাষা। এই ভাষায় আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে দু'দেশের লেখক লেখিকাদেরই রচনা সমস্ত বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। রাষ্ট্রনৈতিক বাধার জন্যই দু'দেশে এমন কোনো পত্র-পত্রিকা নেই, যাতে দু'দিকের লেখক-লেখিকাদের রচনা সমান ভাবে প্রকাশিত হতে পারে, কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস আছে মাত্র। সেইজন্যই এরকম সংকলনের উপযোগিতা খুব বেশী। ভবিতব্য আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে জানি না, হয়তো এক সময় এই সব সংকলন ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গণ্য হবে। আরও যত বেশী প্রকাশক এ জাতীয় সংকলনে উদ্যোগী হবেন, ততই মঙ্গল।

দু'দেশের সাহিত্যের ভাষা এক হলেও রীতি কিছুটা পৃথক, স্বাদও আলাদা। সাহিত্য এক হিসেবে সমসাময়িক ইতিহাসও বটে। সামাজিক দুর্যোগ ও রাষ্ট্রনৈতিক অদল-বদলের ছাপ সাহিত্যে পড়তে বাধ্য।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরেও ঐ ভূখণ্ডে প্রচুর উত্থান-পতন, প্রলোভন ও নিষ্পেষণের ঘটনা ঘটেছে। তার প্রতিক্রিয়া শুধু যে সাহিত্যিকদের মানসিকতাতেই পড়েছে তাই-ই নয়, আঙ্গিকেরও বদল ঘটেছে সেই কারণে। পশ্চিম বাংলাতেও অনাচার-তাণ্ডব কম ঘটে নি। কিন্তু তার চরিত্র অন্যরকম। পূর্ব পাকিস্তানে এক সময়ে জোর করে বাংলাভাষাকে বিকৃত বা অবরুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল বলেই তার প্রতিবাদে বাংলাভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এবং ভাষাকে ভালোবাসার গর্ব অনেক সময় নির্লজ্জ হয়েছে। আর ভারতে বাংলাভাষার ওপর কোনো জোর জুলুম করা না হলেও নানারকম সরকারি উদ্যোগে বা অবহেলায় বাংলাভাষার গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে খর্ব হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে সম্পর্কে এদিকের অধিকাংশ বাঙালীই উদাসীন। অনেক সময় লেখকরা একচক্ষু হরিণের মতন বাংলাভাষার সূক্ষ্ম অলঙ্কার নিয়ে খেলা করছেন, ওদিকে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বাংলাভাষার ব্যবহারই যে কমে যাচ্ছে, সে খেয়াল নেই।

এই সংকলনের কবিতাগুলিকে নিছক ভালো বা মন্দ, এই মানদণ্ডে বিচার করা যাবে না। এতে ফুটে উঠেছে দুই বাংলার সমসাময়িক কবিদের সামগ্রিক পরিচয়।

দুই বাংলার কবিতা নির্বাচন করার জন্য দু'জন সম্পাদক। বন্ধুবর শামসুর রাহমান অত্যন্ত যত্নে ও পরিশ্রমে বাংলাদেশের কবিদের পাণ্ডুলিপি ও পরিচিতি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দু'জনের দুটি পৃথক সম্পাদকীয় লেখার কথা ছিল, কিন্তু শামসুর রাহমান সম্প্রতি কিছুটা অসুস্থ ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়ার ফলে ভূমিকা লিখতে পারেন নি। পরবর্তী কোনো সংস্করণে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা অবশ্যই যুক্ত হবে। এবারে তাঁর হয়ে আমি একাই দায়িত্ব বহন করেছি। এই সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা, উদ্যম, মুদ্রণ সৌষ্ঠব ইত্যাদির জন্য প্রকাশকদের পক্ষে জয়দেব ঘোষ ও দেবব্রত মল্লিক বিশেষ ধন্যবাদার্হ। সম্পাদনার কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা কিছু যদি প্রাপ্য হয়, তবে তার নব্বই ভাগ শামসুর রাহমানের, আর নিন্দার উননব্বই ভাগ আমার।

শামসুর রাহমান   সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশের কবিতা

সম্পাদনা ঃ শামসুর রাহমান

সূচীপত্র

বাংলাদেশ

সূচীপত্র

পশ্চিমবঙ্গ

প্রেমারণ্য

মতিউল ইসলাম

চাঁদ নয়, তবু ঠিক চাঁদের মতন,
ছায়া নয়, তবু স্বচ্ছ ছায়ার মতন,
প্রেম আসে, প্রেম যায়
আমাদের জীবনের জীর্ণ-গালিচায় !

চোখ নয়, তবু জাগে
এক জোড়া চোখ—
সজল কাজল দু'টি চোখ,
সেই চোখে চোখ-রেখে
যদি কারো মন
পরিচিতা কুমারীর বুকে
সকৌতুকে
ঘুমাইতে চায়,
অমনি সে মেয়ে আর
প্রেমের অরণ্য তার
দূর হ'তে দূরে স'রে যায় !

এইভাবে ছত্রিশ বছর

আহসান হাবীব

এই ভালো এইভাবে ছত্রিশ বছর
এইভাবে ঠিকানাবিহীন
এইভাবে পরস্পর সুদূর অজ্ঞাতবাস
এই ভালো
এভাবেই পাওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত যাপন, আর
অমরত্ব পাওয়া যায় মৃত্যুকে এড়িয়ে থাকা যায়
এইভাবে সুদূর অজ্ঞাতবাসে প্রচণ্ড খরায় খুব
ক্লান্ত হতে হতে
ক্লান্ত হতে হতে
অনায়াস তোমার বেণীতে ক্লান্ত হাত রেখে
বলতে পারি : কি সুন্দর ! তুমিও তখন
বলতে পারো : খুলে দিলে আরো বেশী
ভালো লাগবে. ছুঁয়ে দেখো, দেখনা ; অথবা
ক্লাশক্লান্ত তোমার চিবুক থেকে
একটি ছোট রূপালি ঘামের কুচি তুলে নিলে
তর্জনী উঁচিয়ে তুমি বলতে পারো :
হে বালক দুষ্টুমী কোর না।
কোনো কোনো রাতে খুব ঘন বৃষ্টি হলে জানালায়
একাকী দাঁড়িয়ে
বাইরে চোখ মেলে দেখতে পাই
কলেজ চত্বর ছেড়ে বেরোচ্ছো অস্থির পায়ে দৃষ্টি এলোমেলো
বলি, এতক্ষণে !ক টা ক্লাশ ? কতকাল দাঁড়িয়ে রয়েছি
তুমি শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিয়ে বলতে পারো :
এই ভালো, আরো বেশী ক্লান্ত হও
ভালো লাগে অপেক্ষায় রাখা !

তারপর ফুটপাথ্ জনারণ্য ট্রামবাস
ট্যাক্সির গর্জন সব মুছে দিয়ে
কি নির্জন কি নির্জন!
নিরুদ্দেশ এবং উধাও হতে হতে দেখে যেতে পারি
বুকের ওপর ন্যস্ত বইখাতা বেণীর মোহন যাদু
আঠারোর অঙ্গশ্রী এবং তোমার চোখের পাতা জুড়ে
বসন্ত বাগান বাসা সরোবর চিত্রিত হরিণ।

এই ভালো, এইভাবে ছত্রিশ বছর
বাসা পেলে এতদিনে বয়স বেড়ে যেতো
মেঘের বরণ চুল বেশ কিছু শাদা হতো
দুজনই অসুস্থ হতে হতে মৃত্যুর কথাও খুব মনে পড়ে যেতো।

এই ভালো এও ভালো
এইভাবে অজ্ঞাতবাসের খেলা
এভাবেই নীল আলোটি জ্বালিয়ে তুমি রয়ে গেছো
আঠারো উনিশে স্থির, আমি চব্বিশে পঁচিশে
এই ভালো।

শাহরিয়ার

ফররুখ আহমদ

শাহেরজাদীর ঝরোকায় এসে সাইমুখ স্নায়ু শ্রান্ত শিথিল,
খোঁজে ওয়েসিস মরু সাহারার চিড়-খাওয়া দিল শূন্য নিখিল।

এ মৃত ঊষর বালুতে আবার জাগাবে আনার দানা,
কালো কামনার লাগাম ধরবে টানি ?
উচ্ছৃঙ্খল রাতের ভুলের আজ বুঝি শেষ নাই
ভুলের মাটিতে ফুটবেনা ফুল জানি।

হাজার নাজুক কুমারীর মুখ ভাষায়ে লোহুর স্রোতে
ছুটেছিল সিয়া জিন্দেগী নিয়ে যে পশু মৃত্যুপারে,
হাজার ইশারা ডেকে ডেকে গেছে তারে
থামেনি তবু সে অন্ধ ছুটেছে পথ হ'তে ভুল পথে ....

মনে পড়ে সেই নওল ঊষার হাসিন পিয়ারা দিল
গ্লানি-কলঙ্কে মুছে গেছে হায় আমার সারা নিখিল,
সারা মনে ভাসে রক্তের লাল ছোপ ;
সারা গায় জাগে কলুষিত বদফাল ;
জাগে জঘন্য লালসার কালো পাপ ;
শাহ্‌রিয়ারের নীল আকাশের সিতারা করে বিলোপ ....

শিরায় আমার জাগে নাকো আর জোছনা-শারাব ধারা
আগুনের মত জ্বলে বুকে ইন্‌সাফ,
সাত আলিশান চাঁদোয়ার নীচে যেন এ গোর আজাব,
জড়োয়া জড়ানো কিংখাবে জাগে এ মন সর্বহারা,
খুঁজে ফেরে শুধু দিলের দোসর তার
চিড় খেয়ে বুকে জেগে ওঠে শুধু সাথীহারা হাহাকার।

হাজার রাতের কাহিনী তোমার
হাজার রাতের গান,
ধরে মাহ্‌তাব সে রঙিন খবাব
জাগে সুর সন্ধান।
সেতারের তারে যে শূন্য ব্যর্থতা
ম্লান পেরেশান শূন্য শিথান শুনে যাই সেই কথা।

মনে পড়ে শুধু অসংখ্য 'বদকার'
কোন্ কুহকিনী আঙ্গুস্তরী স্মৃতি,
ঢেকেছে আমার মুক্ত নীল কিনার
জিন্দেগী মোর হ'ল আজ শোকগীতি।
পিয়াসী এ মন সুদূর সওদাগর
নয়া জৌলুসে হারানো ভিটাতে বাঁধিতে চায় সে ঘর।

চাঁদির তখ্‌তে চাঁদ ডুবে যায়
পাহাড় পেতেছে জানু,
নতুন আকাশে জীবনের সুর
জাগাও হাসিন বানু।

অথচ জানি এ জিন্দেগী ঘোরে যেন এক পরোয়ানা,
বাঁকা সড়কের পথে মেলে ফের কমজোর লোভী ডানা,
তুফানের মাঝে হ'তে চায় বানচাল,
জানে সে কোথায় সূর্য তবুও টানে সে আঁখি আড়াল
ফিরে ফিরে চায় ডুবতে অন্ধ পাঁকে ;
ঢেলে যেতে চায় জহরের জ্বালা জীবনের প্রতি বাঁকে।

ছুটেছে সে আজ অন্ধের বেগে পাহাড় যেখানে ঢালু ;
ম্লান সাহারায় প'ড়ে আছে হায় মুর্দার মত বালু,
যে বিরাণ মাঠে ফাটে না আনার দানা
সেই নিরন্ধ্র মাঠে এ অন্ধ মন ছোটে একটানা ;
উল্কা-আহত পথে পথে ফেরে কাঁদি'।

জুল্‌মাত-ম্লান ডেরায় চেরাগ জ্বালাও শাহেরজাদী !
আমার মাটিতে ছড়াও আনার দানা,
হে উজীর-জাদী। আজ তুমি আর শুনো না কারুর মানা ;
হাজার নাজুক কমনীয় মুখ যেখানে ভাস্‌ছে, আর
আতশী দহনে খুনের তুফানে জ্বলছে শাহরিয়ার ।।

গতানুগতিক

সিকানদার আবু জাফর

অনেক দ্বিধা আর কুণ্ঠার সমুদ্র পেরিয়ে
সংকল্পের তীর।

নেশায় আচ্ছন্ন তবু কোনো এক অসম্ভব মুহূর্তে
তোমাকে বললাম ঃ
ভালোবেসেছি।
সন্তর্পণে, যেন অপরাধ-ভীত,
ফলাফলের অপেক্ষা না রেখে
কোনোক্রমে আত্ম-নিবেদন ঃ
প্রথম-দেখা বাঘের গায়ে
নতুন শিকারীর আচ্ছন্ন তীরন্দাজী।

আমার দুঃসাহসে তুমি লাল হয়ে ওঠোনি।
হয়ত জানতে, আমি জানার আগেই,
এ-সাহস একদিন হবে।
ঠোঁটের কোণে উপেক্ষার হাসি হেসেছিলে কিনা
বলতে পারব না।
কথাটা তোমাকে বলে ফেলেই
বুকের কাঁপুনিতে আমি বিভ্রান্ত ছিলাম।
নিজেকে সামলে নিয়ে
আবার যখন তোমাকে দেখেছি,
তখন তুমি প্রশান্ত।
তাই বুঝতে পারিনি
আমাকে প্রশ্রয় দিলে কিনা।

অবশ্য প্রশ্রয় না পেলেও
তোমাকে ভালোবাসা জানাবার দ্বিধা
ঘুচে গিয়েই ছিল
মনে যে-কথা এসেছে
যে-কথা চেপে রাখতে বুক গেছে ফেটে,
তোমাকে বলেছি।
বাড়িয়ে বলিনি
কিংবা রং ফলিয়ে

তুমি আমাকে আশা দাওনি
কিন্তু নিরাশও করোনি।
এই ছলনার ভূমিকাটুকুতে
তোমার অভিনয় অসাধারণ।
প্রার্থী আমি একাই ছিলাম না।
আরও যারা ছিল
আমার মত তাদের সকলকে তুমি
নিরুদ্বেগ রেখেছিলে।
বোধ হয় যাকে বেছে নেবে
তার যোগ্যতা যাচাই করবার জন্যে
সময় নিচ্ছিলে।
কিন্তু আমার উৎকণ্ঠা অশেষ।

তাই তোমার সম্মতিটুকুর জন্যে
আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম,
আর
তোমাকে অস্থির করে তুলেছিলাম।

তাই সম্ভবতঃ নিরুপায় হয়ে
আমাকে কথা দিয়েছিলে,
তোমার আগামী জন্মদিনে
সন্ধ্যার কয়েকটি মুহূর্ত আমার জন্যে নির্জন রাখবে,
তোমার দাক্ষিণ্যে
আমাকে ধন্য করবে।

তোমার জন্মদিন।

সকাল থেকে
কত উদ্বেগের ভেতরে যে সন্ধ্যে হল!
কতবার যে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল হৃদয়ের শব্দে
চমকে উঠলাম।

প্রতিশ্রুত সন্ধ্যায়
তোমার সঙ্গে নির্জন হ'তে চলেছি;
তুমি তখন
জন্মদিনের উপহার পাওয়া গাড়ীতে
যোগ্যতম বন্ধুর পার্শ্ববর্তিনী।
হয়ত নির্জনতর হবার রোমাঞ্চ-সঙ্কেতে
মুখেচোখে তৃপ্তির উত্তাপ।

আমার জবাব পেলাম।
তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি কি না?
না।
আমরা যে-সমাজের জীব
তারই ধারায় তুমি ভাসমান তৃণ।
ইতিহাস পরিবর্তনের দিন এলে
হৃদয় নিয়ে তুমি খেলবে না,
আমি জানি।

গোধূলি শেষের আলোছায়া

আবুল হোসেন

একটু বসো। তোমার অনেক কাজ জানি। সারাদিন
দম-দেওয়া পুতুলের মতো চোখ বুজে ঘুরবে ঘর-
বাড়িতে একাই। যাই, নাশ্‌তা দিতে হবে, বাজারের
ব্যাগটা কোথায়। মেঘে মেঘে অনেক তো বেলা হলো,
জীবনের আলো থিতিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে সংসারের
আলুথালু বাগানে, তোমার মোটেই সময় নেই,
আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায় স্মৃতির ফ্রিজারে
অনেক দিনের জমানো বরফগুলো। দেখি বসে।
তোমার কি হবে না সময় আজও একটু? বাড়ি ভরতি
লোক, দরজা খোলা, কী যে বলো। যাবার জায়গা নেই
কোন, সব ঠিকানা ঝাপসা। বসবার ঘরে ছাই-
দানিতে সুখের চুরুটের পোড়া গন্ধ কতকাল
থাকবে আর, নির্লজ্জ বাতাস এলোমেলো করবে চুল,
শাড়ীর আঁচল অতীতের দুঃসাহসিকতায়,
দেখবো কেবল বসে। চশমার কাঁচে সময়ের
মাকড়শা জাল, ধুলোবালি, সারাক্ষণ কিচকিচ
ক'রবে আর আমি যৌবনের ফ্যাকাশে তুলোজমাট
বালিশে হেলান দিয়ে বেঁচে থাকবার মহড়ায়
এ পাশ ও পাশ করি। এসো, একটুখানি বসো দেখি,
গোধূলি শেষের আলো খেলা করুক তোমার এলো-
চুলে, চিবুকে ও ঠোঁটে, সন্ধ্যার মেঘলা অন্ধকারে
দেখি চাঁদ ডুবলো কি। এখন তারারা ডাকবে না?

যেখানেই তুমি

সৈয়দ আলী আহসান

যেখানেই তুমি সেখানে শ্রাবণ
অথবা প্লাবন আগ্রহের,
যেখানে একদা বিরহ-ব্যাকুল
অথবা আকুল সমারোহের ;
অনেক কথার দ্বিধায় অচল
অথবা সজল সব শেষের,
আনন্দে দীপ তোমার নয়ন
যেন স্মরণ উৎসবের।

যেখানে তোমার চোখের সাগর
স্বপ্ন-বাসর সকল কাল,
সেখানে আমার প্রহর হারায়
দু'হাত বাড়ায় অনাদি কাল ;
যেখানে রাজ্য শুভ সংবাদ
অবিসংবাদ কামনালীন,
সেখানে ঘটনা পলাশের ফুলে
অথবা মুকুলে সব বিলীন।

যেখানে তোমার অধরের শিখা
যেন প্রহেলিকা দীপ্ত গান,
সেখানে কথারা কৌতুক সহ
আনে দুঃসহ অনভিমান ;
যেখানে শব্দ ওষ্ঠের তাপে
বিগলিত কাঁপে মদিরা যেন,
সেখানে বাতাসে সচকিত কাল
আকাশ পাতাল তরল যেন।

যেখানে তোমার ভুজবন্ধন
যেন অঙ্গন মহাদেশের,
সেখানে সকলে সীমানা হারায়
আকাশ নীলায় মহাকালের ;
মধ্যযুগের লতার মতন
গম্যভুবন অনির্দেশ,
এখানে হয়তো আমলকী শাখা
অথবা প্রশাখা ভগ্ন-শেষ।

বুকের প্রসাদ লীলার কমল
লঘু চঞ্চল কম্পমান,
আলো-মসৃণ একটি লেখার
যেনবা রেখার সব প্রমাণ ;
হৃদয়-আকাশে দুইটি নয়ন
তিলকাঞ্চন উজ্জীবন,
করাঙ্গুলীর রেখা-বিন্যাসে
তরঙ্গাকাশে সঞ্চরণ।

ক্ষীণ কটি-দেশ একমুঠো ফুল
যেনবা অতুল অলৌকিক,
দুটি কুবলয় মৃণাল শোভায়
আশায় আশায় সকল দিক ;
গুরুভার নিয়ে কটির পরিধি
নিয়ম বা বিধি অতিক্রম,
পলাতক রাতে প্রবল শাসন
যেনবা আসন-ব্যতিক্রম।

প্রাচীন কাব্যে উরু-সংযোগ
যেনবা অমোঘ দ্বিদল ফুল,
অরণ্যে যেন একাকী মৃগের
পদচিহ্নের রূপ অতুল ;
সেখানে পুরুষ সূর্য সমান
রূপ অম্লান অসংশয়,
সেখানে রাজ্য মধুর প্লাবনে
সর্ব-স্মরণে অদেয় নয়।

পরিত্যক্ত দুর্গে যেমন
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা তারা,
লেবুর শাখায় পাখিরা হঠাৎ
যেন দৈবাৎ কাকলীহারা ;
যেনবা বাতাসে হাঁসের পালক
যেন দর্শক অনবধান,
ঘন নিকুঞ্জে অনভিব্যক্ত
যেন অনুক্ত সম্প্রদান।

নিগূঢ় শ্রোণির গুরুভারে যার
যেন উৎসার অশান্তির,
হংস-গমনে দ্বৈত আলাপ
কামনা যেনবা দীপাবলীর ;
সমুদ্রতল প্রবাল বাসর
অথবা পাথর যেন উপল,
অধোগতি ঢেউ সেখানে কুমারী
শ্রীময়ী সে নারী প্রাণোচ্ছল।

যেখানে রমণী শ্রাবণ-বন্যা
যেন অনন্যা আগ্রহের,
সেখানে হৃদয় বিগলিত গান
যেন অম্লান সঞ্চয়ের ;
যেন প্রদীপের সব সংলাপ
সূর্যের তাপ অসংশয়,
সেখানে রাজ্য মধুর প্লাবনে
সর্ব-স্মরণে অদেয় নয় ।।

অষ্টপ্রহরিকা

সানাউল হক

সন্ধ্যায় তুমি আসবে বলে
একটি সম্পূর্ণ বিকেলকে আমি
কাঠের সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম

রাত্রে তোমার সময় হবে জেনে
একটি দিনকে তাড়াহুড়োর ছুতোয়
ক্ষুদ্র সম্ভাষণে বিদায় দিয়েছিলাম

ভোরে তুমি পদ্মিনী শুভ্রতা হবে বলে
আমি রাত্রির সমস্ত বাতিগুলো
স্বহস্তেই নিবিয়ে দিয়েছিলাম

এবং দুপুরে তুমি শঙ্খিনী হবে স্থিরতায়
টেলিফোন, ঘুঘু ও কাককে
আমার চৌহদ্দিতে আসতে বারণ করেছিলাম

এবং সায়াহ্নে তুমি আসবে প্রত্যয়ে
আমি দিবানিদ্রাকে রাত্রির অন্ধকারে
একটি দিনের জন্য ছুটি দিয়েছিলাম।

সংগীতাকে

আবদুল গণি হাজারী

সদ্যজাগ্রত পৃথিবীর শরীরে
তোমার লীলায়িত আলাপ
মেঘের স্পর্শ যেন
আকাশের নাভিমূলে।

হে সংগীতা তুমি
আমার সমুদ্রে টান দাও
রঙিন ঝিনুকে সজ্জিত বিছানায়
আমার হৃদয়কে আস্তীর্ণ করো
এবং আমার মনের মীনকে সন্ত্রস্ত করো
সহস্র সুরের সন্তানে।

তোমার যন্ত্রের মীড়ে
আমার বিশ্বাসী পিতার একান্ত মোনাজাত
আমার উদ্বিগ্ন মায়ের বক্ষের উষ্ণতা
তোমার দ্রুত আঙুলে সঞ্চালিত
আমার প্রাত্যহিক স্বপ্নরেশ
ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রশান্তির পর্দায়
ভৈরবী হয়ে দোলে।

যদি দেখা হতো

হাবীবুর রহমান

আজকের এই দুটি কথা
এতো সহজে বলতে কি পারতাম
যদি দেখা হতো আরও
বছর পনেরো আগে কোনদিন!

সেদিন ফুলের পাপড়িতে
রঙ বদল হতো সকাল-সন্ধ্যেয়,
আকাশের তারায় তারায় উঠতো গুঞ্জরণ,
স্বচ্ছ রেশমী বেলার লোলুপতায়
ঝরতো আলোর শিকর থোকায় থোকায়,
লাল আর হলদে পরাগে
জাগতো নীরব কথার সংগীত!
আর একটি কল্পলোকের স্বপ্ন
দক্ষিণের প্রলুব্ধ হাওয়ার তারে
নীড় টানতো স্বতঃস্ফূর্ত!

এই দুটি সহজ কথা—তাদের
কথার দেয়ালের স্থাপত্যের আড়ালে
আর একটি নতুন অর্থের সংযোজন করতো
রঙীন তুলির কোমলাভ কারুকার্যে।
দুটি বিমুগ্ধ চোখের
ডাক আসতো মায়াবী হরিণের
চিত্রিত পাটল তনুর আমন্ত্রণের মতো।
তারি শরে আহত কুরঙ্গিনীর
কোমল মন প্রদোষ-কালের মূর্ছিত
আলোর মতো, একটি আকুলতায়
বিহ্বল হতো—তুহিনের মতো শুভ্র
দুটি কপোলে জাগতো বিলাসের মৌসুম

অর্ধনমিত পয়োধরের তামাটে উত্তুংগতায়
করুণ হয়ে উঠতো একটি মাত্র বিলাপ।
আর শুধুই এক অতৃপ্ত জ্বালা নিয়ে
আক্ষেপে ফেটে পড়তো আমার
তরুণ শিকারী মনে মনে ; রোদ ঝিলমিল
প্রমোদ-ক্লান্ত হ্রদের কচি ঘাসের বনে।

আজ সে শুধুই কল্পনা, ব্যর্থতার
গ্লানিময় ইতিহাসের টুক্‌রো যেনো!
তাই ভাবি অবাক হয়ে, এই দুটি কথা
এতো সহজে কি বল্‌তে পারতাম
যদি দেখা হতো আরও
বছর পনেরো আগে কোনদিন!

উল্লাপাড়া স্টেশন

আব্দুর রশীদ খান

উনিশ বছর পরে
উল্লাপাড়ায় দেখা হলো আবার নতুন ক'রে।

উনিশ বছর আগে
রোশনা বেগম দাঁড়িয়েছিলেন সবার পুরোভাগে।
চোখের দেখায় মনের নেশায় মত্ত ঝড়ের খেলা ;
রক্তে নাচন বক্ষে কাঁপন, পৃথ্বী অবহেলা।
মনের আশা মুখের ভাষা সদ্য-ফোটা পদ্ম ;
ধরায় কেবল দুইটি নয়ন নেশায় অনবদ্য।
রাত হলো দিন, দিন হলো রাত,
সৃষ্টিছাড়া ঘূর্ণি-হাওয়া-ঘুর্ ঃ
বুঝেছিলাম একটা নতুন সুর।

এরই মধ্যে উনিশ বছর বইলো কালের ধারা।
গাড়ীর চাকায় মনকে বেঁধে এখন উল্লাপাড়া।।

কাছে এলাম, দূরে গেলাম,
নতুন ক'রে শপথ নিলাম।
যুদ্ধ এলো, চলে গেলো, মড়ক এসে হাড় ছড়ালো ;
স্বাধীনতার নতুন আলো
চক্ষে লেগে ধন্য হলাম।

কোথাকার সেই রোশনা বেগম
জীবন-যুদ্ধে কোন্ অতলে তলিয়ে গেলো।
গহন নিশির অতল মনে তবুও তার খানিক পরিচয়
মিথ্যা হবার নয়।

উনিশ বছর ধ'রে
তন্বী রোশনা বেগম ছিলেন আমার মনের ঘরে।।

উনিশ বছর পরে
উল্লাপাড়ায় রোশনা বেগম এলেন হঠাৎ ক'রে।
চিনতে পারা কঠিন বটে চোখ দুটো তাঁর ছাড়া ;
স্বামী পুত্র মেয়ে নাত্‌নি নিয়ে আত্মহারা।
হেসে তিনি বলেছিলেন আগের দু'চোখ তুলে :
'একটি বারও খবর নিতে হয় না বুঝি ভুলে ?'
—দিব্যি মোটা, দিব্যি খুশী, কানে হীরের ফুল,
সত্যি কি এ রোশনা বেগম ?—ভুল !
'কয়টি ছেলেমেয়ে ?'—
রোশনা বেগম বলেছিলেন যেন এক গা নেয়ে।
বলেছিলাম, 'বিয়ে আমার হয়নি আজো, তাই ......'
দীপ্তিতে এক চমক দিয়েই রোশনা বেগম হয়ে গেলেন ছাই।

উল্লাপাড়ায় রওশনআরার চরম পরাজয়।
উল্লাপাড়ায় হারিয়ে এলাম জীবন স্বপ্নময়।।

সে

আবদুস্ সাত্তার

না, সে নয়। তার কণ্ঠস্বর আমি ভালো করে চিনি।
বাঁকানো ভ্রূভঙ্গি নিয়ে অকারণে ওপাশের ছাদে
অযাচিত ঘোরাফেরা, এ বেলা ও বেলা নির্বিবাদে
বই পড়া, খোঁপা খুলে চুল বাঁধা, এ সব কাহিনী
রয়েছে অনেক এই জান্‌লায়। আমি কী যে ঋণী
রোদ ও হাওয়ার কাছে; সন্ধানী চোখের বিনিময়ে
তার দেখা, তার ঘ্রাণ নির্মল বাতাসে সবিস্ময়ে
হৃদয়ের বহু কাছে সে যে ছিল স্বপ্ন-বিলাসিনী।

সে আসেনি। কোনোদিন আসবে না। মুহূর্তের ভুলে
তাকে তো করেছি পর, বিদায় বেলায় বেদনাকে
অশ্রুতে লুকালো শুধু চোখের কোণায়। আমি তাকে
কোথায় খুঁজবো? তার আবিষ্কার হবে না ভূগোলে।
সে আছে, যায় নি। চিরদিনের মতন তার নাম
স্মৃতির ফলকে আমি লিখেছি; বুঝেছি কতো দাম।

ট্রেন

আশরাফ সিদ্দিকী

ছুটছে ট্রেন। পেরিয়ে পথ। পেরিয়ে মাঠ বন।
ঢুলছি আমি। ঢুলছো তুমি। কাঁপছে তোমার চুল।
ছোট্ট নদী এই পালালো! এ কোন্ ইস্টেশন!
দুলছি আমি। দুলছো তুমি। দুলছে তোমার চুল।

চলছে ট্রেন। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে সাথে।
এগিয়ে চলে বয়স মন দিবস জ্যোছনাতে।।

সকাল সাঁঝে দিবস রাতে আলোক আঁধিয়ারে ঃ
ছুটছে ট্রেন! আমরা যাবো দূর সে তেপান্তরে!
ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে পথ যে অনেক দূর!
এরির মধ্যে দেখা হ'লো অনেক জনার সাথে।
আলাপ হলো! চায়ের কাপে একটুখানি ঝড়।
তারপরেতেই নতুন স্টেশন। বিদায়! নমস্কার।

মিলিয়ে গেলো কোথায় তারা কোন সে তেপান্তর!
সন্ধ্যাভাষা! নতুন পথিক স্থান নিয়েছে তার।
নতুন পথিক! নতুন কথা! নতুন আলাপন!
দুলছি আমি। দুলছো তুমি! দুলছে মাঠ বন।

কাল সকালে নাবনে গিয়ে সে কোন্ ইস্টেশন!!

উপশমহীন

আতাউর রহমান

একি ব্যাধি দিলে প্রভু, বিষ ছাড়া নেই উপশম,
অনুপান চাই তাতে মধুকণা সৌরভ ফুলের
ক্রোধের প্রহার চাই— নিষ্পেষণ নগ্ন বেশরম
আরো চাই তার সাথে মন্ত্রবাণী কবি—মাতালের।
একি ব্যাধি দিলে প্রভু হাড়ে মাংসে তৃষ্ণার আকুতি
ওষ্ঠ জিহ্বা ত্বক নখ—যত অঙ্গ ভেতর বাহির
সকলের খাদ্য চাই—প্রণয়ের পবিত্র আরতি
মুক্ত নয় ক্ষুধা থেকে—তাপে পোড়ে হৃদয়শরীর।

অশ্রান্ত ক্ষুধার তাড়া কেড়ে নেয় বিশ্রামের ছায়া
স্বপনের মায়া পুষ্প ছিঁড়ে ফেলে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন,
বিষের প্রণয়ে তৃপ্ত আরাধনা বেলেল্লা বেহায়া—
বাস্তুভিটে কেড়ে নিয়ে—সৃষ্টি করে আলেয়া রঙীন,

উপশমহীন ব্যাধি হানে বেত আঁধারে আলোকে
শেষ নেই আবর্তের কর্দমাক্ত কুটিল ভূলোকে।

উৎসর্গ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

চোখের কোণে সুখের হাসি সেই টুকুরই জন্যে
ওগো কন্যে
আমি একটুখানি ছোট্ট পুকুর
শান্ত সকাল স্তব্ধ দুপুর
শিউলি বকুল চাঁপা ফুলের সুগন্ধ
চেয়েছিলাম, যাতে তোমার আনন্দ

বুকের মধ্যে সুখের ছোঁয়া সেই টুকুরই জন্যে
ওগো কন্যে
আমি রাঙা মোরগ কতো রকম
নোটন পায়রা বকম বকম
দুগ্ধবতী গাইএর খোঁজে দুরন্ত
মনে মনেই অন্য যুগের সামন্ত।

চোখের কোণে সুখের হাসি সেই টুকুরই জন্যে
ওগো কন্যে
আমি চিত্রকরের লেখন তুলে
সারা দুপুর হেলে দুলে
কল্পনারই কুটির করি জীবন্ত
ইচ্ছে আমার ছোটে যে দিক দিগন্ত।

বুকের মধ্যে সুখের ছোঁয়া সেই টুকুরই জন্যে
ওগো কন্যে
আমি আপাতত শব্দ নদীর
গভীর জলে আমার অধীর—
ছিপ ফেলেছি, হয়তো কিছু আসন্ন,
এবং তুমি হতেও পারো প্রসন্ন।

যদি তুমি ফিরে না আসো

শামসুর রাহমান

তুমি আমাকে ভুলে যাবে, আমি ভাবতেই পারি না।
আমাকে মন থেকে মুছে ফেলে
তুমি
আছো এই সংসারে, হাঁটছো বারান্দায়, মুখ দেখছো
আয়নায়, আঙুলে জড়াচ্ছো চুল, দেখছো
তোমার
সিঁথি দিয়ে বেরিয়ে গেছে অন্তহীন উদ্যানের পথ, দেখছো
তোমার হাতের তালুতে ঝলমল করছে রূপালী শহর,
আমাকে মন থেকে মুছে ফেলে
তুমি অস্তিত্বের ভূভাগে ফোটাচ্ছো ফুল,
আমি ভাবতেই পারি না।

যখনই ভাবি, হঠাৎ কোনো একদিন তুমি
আমাকে ভুলে যেতে পারো,
যেমন ভুলে গেছো অনেকদিন আগে পড়া
কোনো উপন্যাস, তখন ভয়
কালো কামিজ প'রে হাজির হয় আমার সামনে,
পায়চারি করে ঘন ঘন মগজের মেঝেতে,
তখন
একটা বুনো ঘোড়া ক্ষুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে আমাকে
আর আমার আর্তনাদ ঘুরপাক খেতে খেতে
অবসন্ন হ'য়ে নিশ্চুপ এক সময়, যেমন
ভ্রষ্ট পথিকের চিৎকার হারিয়ে যায় বিশাল মরুভূমিতে।

বিদায় বেলায় সাঁঝটাঝ আমি মানি না,
আমি চাই ফিরে এসো তুমি স্মৃতিবিস্মৃতির প্রান্তর
পেরিয়ে
শাড়ির ঢেউ তুলে, সব অশ্লীল চিৎকার, সব বর্বর
বচসা স্তব্ধ ক'রে দিয়ে ফিরে এসো তুমি,
ফিরে এসো স্বপ্নের মতো চিলেকোঠায়,
মিশে যাও আমার হৃদস্পন্দনে।

কোথায় আমাদের সেই অনুচ্চারিত অঙ্গীকার ?
কোথায় সেই অঙ্গীকার
যা রচিত হয়েছিলো চোখের বিদ্যুতের বর্ণমালায় ?
আমরা কি সেই অঙ্গীকারে দিইনি এঁটে
আমাদের চুম্বনের সীলমোহর ?
আমি ভাবতেই পারি না সেই পবিত্র দলিল ধুলোয় লুটিয়ে
দুপায়ে মাড়িয়ে, পেছনে একটা চোরাবালি রেখে
তুমি চলে যাবে স্তব্ধতার গলায় দীর্ঘশ্বাস পুরে !

আমার চোখ মধ্যদিনের পাখির মতো ডেকে বলছে—তুমি এসো,
আমার হাত কাতর ভায়োলিন হয়ে ডাকছে—তুমি এসো,
আমার ঠোঁট তৃষ্ণার্ত তটরেখার মতো ডাকছে—তুমি এসো।
যদি তুমি ফিরে না আসো,
গীতবিতানের শব্দমালা মরুচারী পাখির মতো
কর্কশ পাখসাটে মিলিয়ে যাবে শূন্যে,
আর্ট গ্যালারীর প্রতিটি চিত্রের জায়গায় জুড়ে থাকবে
হা-হা শূন্যতা,
ভাস্করের প্রতিটি মূর্তি পুনরায় হ'য়ে যাবে কেবলি পাথর,
সবগুলো সেতার, সরোদ, গীটার, বেহালা
শুধু স্তূপ-স্তূপ কাষ্ঠখন্ড হ'য়ে পড়ে থাকবে এক কোণে।

যদি তুমি ফিরে না আসো,
গরুর ওলান থেকে উধাও হবে দুধের ধারা,
প্রত্যেকটি রাজহাঁসের সবগুলো পালক ঝরে যাবে,
পদ্মায় একটি মেয়ে ইলিশও আর ছাড়বে না ডিম।
যদি তুমি ফিরে না আসো,
দেশের প্রত্যেক চিত্রকর বর্ণের অলৌকিক ব্যাকরণ
ভুল মেরে বসে থাকবেন, প্রত্যেক কবির খাতায়
কবিতার পংক্তির বদলে পড়ে থাকবে রাশি রাশি মরা মাছি।

যদি তুমি ফিরে না আসো,
এদেশের প্রতিটি বালিকা
থুথুড়ে বুড়ি হ'য়ে যাবে এক পলকে,
দেশের প্রত্যেকটি যুবক খাবে মৃত্যুর মাত্রায়
ঘুমের বড়ি কিংবা গলায় দেবে দড়ি।

যদি তুমি ফিরে না আসো,
ভোরের শীতার্ত হাওয়ার কান্না-পাওয়া চোখে নজরুল ইসলাম
হন্তদন্ত হ'য়ে ফেরি করবেন হরবোলা সংবাদপত্র।

যদি তুমি ফিরে না আসো,
সুজলা বাংলাদেশের প্রতিটি জলাশয় যাবে শুকিয়ে
সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের
প্রতিটি শস্যক্ষেত্র পরিণত হবে মরুভূমির বালিয়াড়িতে,
বাংলাদেশের প্রতিটি গাছ হ'য়ে যাবে পাথরের গাছ,
প্রতিটি পাখি মাটির পাখি।

নীলমনি তুই

আহমদ রফিক

নীলমনি তুই যাস্‌নে চলে,
বন্ধুরা তো দলে দলে
এঘাট ওঘাট নকশা-আঁকা রঙীন নায়ে
পেরিয়ে উধাও আবছা আলোর সোনারগাঁয়ে।

মাঝনদীতে নৌকাটি তোর দেখিস সখি
টালমাটাল এক ঘূর্ণী-ঝড়ের মুখোমুখি
যায়না ভেসে কুহক-জলের তীব্র স্রোতে
বেহুঁশ বেচাল অন্ধকারের অচিন পথে।

ভয় পাসনে, ঢেউয়ের টানে অথৈ জলে
অঙ্গাবরণ যদি খোলে,
রেশমী কোমল ঢেউয়ের নদী জাদু জানে,
লজ্জা ঢাকার রহস্যময় কাব্য জানে।

এলিনে তুই। বুকের ভেতর দরজাগুলো কাঁপতে থাকে
থরথরিয়ে, গুমরে উঠে ডাকে—
শব্দগুলো থমকে দাঁড়ায় বিরল বাঁকে
ছুরির ফলার রক্তঝরার ছবি আঁকে।

নগ্নকান্তি রক্তশিখা আকাশ-চোখে
চিরকালের যন্ত্রণাকে জ্বালিয়ে রাখে।

দর্পণে বসন্ত শ্রাবণ

আজীজুল হক

দুঃখকে শনাক্ত করে দেখি অধিকাংশ দুঃখই সালেহাকে নিয়ে।
আঠাশটি বসন্ত সে দু'হাতে আড়ালে রেখে গাঢ়স্বরে বলে এক
শ্রাবণের কথা। বলে, আজতো অফিস ছুটি, চলো
কিছু ফল কিছু ফুল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক মেঘলা সকালে
হেনাদের বাড়ী ; রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ওর দেহ থেকে জ্বরের উত্তাপ
কিছু নেমে যায়, বিষণ্ণ ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে বেলকুঁড়ি
হাসি। বেলফুল তোমারিতো একদিন বেশি প্রিয় ছিল,
গোলাপে বিতৃষ্ণ তুমি, অশোকে পলাশে দারুণ অনীহা।
অথবা চলো না পার্কে, রোদের ভিতর থেকে ছায়া নেমে এলে
গভীর বিকেলে, দুপুরের রোদ মেখে শ্যামলী হেনারা
অপরাহ্নে কী-রকম দুঃসাহসী হয়েছে দেখবে, অবিকল
প্রেমিকের হাত ধরে ছুটে যাচ্ছে তারা সন্ধ্যার ওপারে,
হঠাৎ উঠছে জ্বলে লাল-নীল-বেগুনি আলোয় একসঙ্গে
নগরের সবগুলো বাতি, দেখবে পাশের লেকে জল
আমারি চোখের মতো টলটল করছে কেমন। আমি
বিকেলে বললাম তাকে, নীল
আকাশে তাকালে তুমি শরতের সব শাদা মেঘে
খয়েরি বেগুনি লাল রঙ ধরে যাবে, নামালেই চোখ
সেই মেঘে ঝরবে শ্রাবণ, সুশোভন কথা বটে, তবে
সমস্যা ওখানে নয়। রোজ রোজ এইভাবে একা-একা আয়নায়
না-দাঁড়ানো ভালো। প্রাচীন দর্পণে দ্যাখো বেশ কিছু ফাটল
ধরেছে, এখানে ওখানে কিছু খসেছে পারদ। এ-পাশ ও-পাশ মুখ
যতই ফেরাও, গ্রীবায় নিপুণ মুদ্রা তোলো, অক্ষম দর্পণ
ফিরিয়ে দেবে না আর সম্পূর্ণ তোমাকে। তুমি আমি
বরং এসোনা

মুখোমুখি হই, মুখোমুখি রাখলেই দু'খানি দর্পণ
ভিতরের ক্ষণচিত্র অন্তহীন দৃশ্য হয়ে যায়।
একদিন তুমিও তো
ও-রকম দুঃসাহসী ছিলে, নগরের লাল-নীল সবগুলো বাতি
আর এক গাঢ় লাল গোলাপে বিশ্বাস
এক সঙ্গে জ্বলে উঠেছিল। অথচ কেন যে তুমি
শ্বেত-মল্লিকার কথা তোলো। বটে
শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথ কিছু বেশি সকরুণ হন, তখন বাগানে
বেল-জুঁই ধারাস্থানে আরো কিছু শুভ্র হয়ে ওঠে, কিন্তু কেন
তুমি সেই স্মৃতিগন্ধা মহিলার অবিকল মুখ
প্রাসঙ্গিক করে তুলে কাঁদো। আড়ালে বসন্ত কাঁদে, আমি
বসন্ত বসন্ত বলে, গোলাপ গোলাপ বলে,
সালেহা সালেহা বলে
দর্পণের পেছনে দাঁড়াই।

তখন ডাকতে পারো

হাসান হাফিজুর রহমান

প্রেমের কতটা বোঝ তুমি,
সেকি পাওয়া, কিছু চাওয়া, হাতে হাত ছোঁওয়া কিংবা
মনের আড়ালে খেলাচ্ছলে যৌনতার উথাল পাতাল ?

তাকে প্রেম বলা ভুলে যাও তুমি।

যখন যখন
রক্তের আগুন সমস্ত সময় জুড়ে পোড়ায় শরীর,
লুপ্ত হয় আলো ও আঁধার, ডুবে যায়
        আবিশ্ব ভুবন কেবলি বিনিদ্র জাগে
পাহাড়ী নদীর মত অন্ধ গতি এবং গর্জমান ভালোবাসা,
এমন কি স্বপ্নটুকু যায় মুছে,

তখন ডাকতে পারো ডাক নাম ধরে তাকে, প্রেম ।।

খুলে দাও

আলাউদ্দিন আল আজাদ

চেঁচিয়ে বলছি দাও, খুলে দাও সকল দরোজা
তোমার বাগানে যাবো বহু আশা হাজার বছর
বুক ভরে নিয়ে পেরিয়ে এসেছি পাহাড় সাগর
নদ নদী তেপান্তর তিতির কান্নার মাঠ, সোজা
পিছে ফেলে ধুক্‌বুক্ হৃৎপিণ্ড হাতের ফিরোজা
অঙ্গুরীয় শুধু কিছু জ্বলে, দাও খুলে সব ঘর
সযত্নে গোপন দক্ষিণ সরণী প্রান্তে সরোবর
রত্নাগারে নিয়ে যাও, আর কত মণিমুক্তা খোঁজা!

সামনে দাঁড়ালে যেন বৃষ্টিস্নাত ফুলের মঞ্জরী
'হে বন্ধু বিদায় দাও' ঠোঁট নেড়ে বললে নিরালা,
'তোমারে কি দিতে পারি প্রতারক বসন্ত যখন?'
'ওকথা বলোনা', বললাম 'কাছে এসো হে সুন্দরী,
ভরপুর চোখে শুধু গলায় পরিয়ে দাও মালা
একফোঁটা অমৃতেই পেয়ে যাবো অনন্ত যৌবন।'

তুমি বড়ো জাগ্রত

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্

এই আমি, আমি ছাড়া কে জানে তোমাকে আর
অতো ভালো ক'রে

আমি ছাড়া
কে জানে একটি দীর্ঘ
সজীব লতার কথা প্রহরে প্রহরে তাও
এতোদিন ধরে

লতাটির দেহলগ্ন সবখানে ফুল হতো রোজ
পাতার আড়ালে সে কি অজস্রতা
কে আর দেখেছে বলো আমি ছাড়া অতো বেশী ফুল আর
লতাটির কোমল নম্রতা

কেউ এসে প্রতিদিন নিজহাতে তুলে নিতো সব ফুল
শীতগ্রীষ্ম সব ঋতুতেই
তখনো দেখেছি লতাটিকে পুষ্পহীন, দীনহীন ভিখিরীর মতো
যখন কোথাও নেই, তার গায়ে কোনো ফুল নেই

অমন বিরাট ক্লান্তি
বিষাদের সব শর্ত মেনে নিয়ে যায়
টিকে থাকা এতোদিন তার সব আর্তনাদ, সব অহংকার
শুনেছি জেনেছি আমি, মনে আছে অবাক বিস্ময়ে
কখনো দেখিনি তার কোনো ভয় জয় পরাজয়ে

আমরা দু'জনে মিলে অত্যাশ্চর্য জীবনের সেই দীর্ঘ লতার মহিম
স্বর্গমর্ত্য কোনখানে কে আর টানবে তার
কৃতিত্বের সুনিশ্চিত সীমা

অকৃতিয়ো কম নয় সুকৃতির পাশে
এ নিয়ে এঁকেছি কেউ, নাকি আমরাই
কিছু ছবি বানিয়েছি লঘু পরিহাসে

তবু কথা থাকে, কথা আছে, এই ধরো আমি দুই হাতে
ছিঁড়েছি, তুলেছি ফুল প্রতিদিন, প্রতিটি প্রভাতে
দস্যুতা করিনি কিছু কম

ছিঁড়েছি সতেজ পাতা খামোকাই কতোদিন এবং চরম
দেখিয়েছি নিষ্ঠুরতা দাঁতে নখে কখনো কখনো
তুমি ছিলে উদাসীন বাড়তি এ উপদ্রবে কিংবা কৌতূহলী
মনে আছে তখনো, তখনো।

তোমারো একটি কাজ ছিলো বটে ফুল ফোটানোর
মনে ছিলো অতোখানি জোর
রাতদিন ফুটিয়েছো ফুল, শুধু ফুল
মেলে না সংখ্যায় তার কোনো পরিমাপ
গণনাও হয় না নির্ভুল

তুমি ছিলে তাই এই জীবনের দীর্ঘ চারুলতা
আনন্দে বিষাদে আছে লতিয়ে পেঁচিয়ে ঠিক
কোনোখানে সেই একাগ্রতা
এপারে তোমার সেই বিখ্যাত পাহারা চোখে পড়ে
ওপারে আমার ঘাঁটি সত্য বটে বেশ নড়বড়ে
সতেজ সবুজদীর্ঘ লতাটিকে রেখেছো টিকিয়ে
মাঝখানে এতোদিন জানিনে কি দিয়ে

জানি খুঁটিনাটি, কতোকিছু ছোট বড়ো তোমার অজস্র কথা
এটুকু জানিনে ব'লে তুমি কিন্তু চিরজয়ী, চিরস্থায়ী
কাছাকাছি আমার ভিন্নতা
ভীষণ ভঙ্গুর আর তাই বুঝি কম্পমান ভয়ে, ত্রাসে, সংশয়ে ব্যাকুল

ছিন্নভিন্ন হচ্ছি রোজ প্রতিটি সকালে
হাত ভরতি, সাজি ভরতি যখনি দেখেছি ফুল
যতোটা তোমাকে জানি, জানি আমি শতগুণ বেশী তারও চেয়ে
সুরভি ছড়ায় ফুলগুলো দ্বিধাহীন গান গেয়ে গেয়ে
তোমার নামেই দেখি নামগান চতুর্দিকে অফুরন্ত সারাক্ষণ
তুমি ছাড়া লতাটিকে কে দিয়েছে এতোখানি
অটুট যৌবন আর এতো দীর্ঘ সম্পন্ন জীবন

আমাকে দাঁড়াতে হয় সত্যি করজোড়ে
এ পথে সে পথে প্রতিদিন ছোটবড়ো মোড়ে
ফুল তুলবার, পাতা ছিঁড়বার কাজ ছাড়া
আমি আর কিছুই করিনি
আমি ছাড়া, এই আমি ছাড়া, কে বলো অতোটা জানে
তুমি বড়ো জাগ্রত সেই তপস্বিনী।

শ্রেষ্ঠ দিন

কায়সুল হক

সেদিন যখন বৃষ্টি নেমেছিল অঝোর ধারায়
মনের মহল্লা জুড়ে যত ঘরবাড়ি
বৃষ্টি আর দামাল বাতাসে
তছনছ।

তখন নিরুপদ্রব মূর্তির মতন
তুমি নিরুপাখ্য এক তন্ময় ভঙ্গিতে
বলে গেলে তোমার নিজের
জীবনের অতীব আশ্চর্য
সব গল্প।

তোমার মমতা ভরা কণ্ঠস্বর ছাড়া
সব শব্দ ডুবে গিয়েছিল
সেদিনের বৃষ্টি আর ঝড়ের নিবিড়ে।
সেদিন.তোমার সেই চোখের অতলে
থমকে দাঁড়ানো এক অপরূপ শিখা
জ্বলে উঠেছিল।

বিজুরীর মতো মাঝে মাঝে অন্ধকার চিরে
তোমার চোখের সেই আলো
যাচ্ছিল আমাকে ছুঁয়ে।
আর টবে রাখা শুষ্ক গোলাপের চারা
দুলে উঠেছিল অসংখ্য পাপড়িতে।

মনে পড়ে, তোমার কি মনে পড়ে
সেই সব ?
সেই উনিশ শো সাতান্ন ইতিহাস আজ
এতোকাল পর এখনো তো মনে হয়
বর্ষণমুখর সেই সন্ধ্যা আমার জীবনে
শ্রেষ্ঠ দিন হয়ে এসেছিল।

কারণ আমার ভালোবাসা

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

কৃষ্ণচূড়া কাটলো যখন
কাঁদতে গিয়ে ঢোক গিলেছি
কারণ আমার ভালোবাসা
অনেক রাতে গান শোনাতে
বলতে গিয়ে আর বলিনি
ইচ্ছা আমার বড় একা।

সেগুনগাছের পাশে-পাশে
হাঁটতে গিয়ে থমকে গেছি
কারণ ওদের ফাঁসি হবে
এখন আমি ঘরে থাকি
জানলা কপাট বন্ধ ক'রে
নইলে গোলাপ ম'রে যাবে।

আমার কাছে কেউ এসো না
এলে কেবল দুঃখ পাবে
কারণ আমার ভালোবাসা
সেগুন গোলাপ কৃষ্ণচূড়া
ভালোবেসে খুন হয়েছে
ইচ্ছা আমার বড় একা।।

শপথের স্বর

আবুবকর সিদ্দিক

আবার আমি ফিরে আসবো
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে
এই কালো কালো খোঁদল
কড়া-পড়া হোঁচটগুলো গোনা শেষ করে
ঘাসের মাথায় আমার জন্যে পেতে রাখা
শিশিরের অভিনন্দনবিন্দুগুলো
ভালবাসায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আবার আসবো আমি
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে।
কহ্লারের পত্র চুঁয়ে চুঁয়ে
প্রমত্ত হাওয়ার ঝর্ণা
আমাদের স্বরযন্ত্রে গান তুলে যাবে
রোদ্দুর পিছলে যাবে
শালিখ ফড়িং চিল কলাপাতায়।
তোমার গালে এসে টোল খাবে
নরম গোধুলি।

তারপর
সমস্ত রাত
আমরা দুজনাই জ্বলব
তাপবিকীরণের তাতে।
সমস্ত বিচ্ছেদ ও বেদনার উপান্তে
আমি আসবো
হেঁটে হেঁটে রক্তাক্ত পায়ে
ছোবল ও তরঙ্গগুলো মাড়িয়ে
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে।
আর
ডান হাতের মুঠোয় আমূল উপড়ে আনবো
আস্ত এক শপথের চারা
তোমার জন্যে।

বিপরীত অর্জনের গাথা

সৈয়দ শামসুল হক

কি ভাবে আমি রোজ বাড়িতে ফিরে যাই তা যদি একবার জানতে,
কি ভাবে ফেরবার সরল পথগুলো সহসা দুঃখের হয়ে যায়,
রাতের বাতিগুলো কঠিন তলোয়ার বিদ্ধ করে চলে আমাকেই,
মাতাল নই তবু পায়ের নিচে মাটি হঠাৎ দুলে ওঠে রাস্তায়।

কারো বা বাগানের ফুলের ডালগুলো শীর্ণ হাত হয়ে ডাক দেয়,
কারো বা জানালার কাচের শার্সিতে হাওয়ার হাহাকার শোনা যায়,
কোথাও কোনো মোড়ে করুণ ভিক্ষুক এখনো প্রত্যাশী দেখা যায়,
কখনো উড়ে যায় একটি খোলা খাম—ঠিকানা লেখা আছে, চিঠি নেই।

জলের উজ্জ্বল মাছের মতো সব রঙীন গাড়িগুলো ঘাই দেয়,
তরুণী চলে যায় একটি তরুণের জামার আস্তিনে রেখে হাত,
উষ্ণদ্বীপ হয়ে অন্ধকারে জাগে নিয়ন-বাতিজ্বলা রেস্তোঁরা,
লম্বা কারো শিস স্তব্ধতাকে ধরে দুলিয়ে দিয়ে যায় হাওয়ায়।

রাতের রাজপথ যেখানে ছায়াঘন সেখানে একজন দাঁড়িয়ে,
হয়ত মানিব্যাগ হঠাৎ কেড়ে নেবে ত্রস্তে হাঁটে তাই কেরাণী,
আমার কিছু নেই যেহেতু তুমি নেই—কি করে এই কথা ব্যাপ্ত ?—
আঁধারে বাগে পেয়ে আনাড়ি লুটেরাও আমাকে করুণায় ছেড়ে দেয়।

কোথাও তিনজন উপুড় হয়ে পড়ে ধুলোয় আঁকা ছকে খেলছে,
আমার ছায়া দেখে ভ্রূকুটি করে তারা, আবার ঘুঁটি চালে একজন,
আমার নেই দান, ডাকা তো দূরে থাক—দেখারও অধিকার মোটে নেই;
সমূহ সরে যাই, সমুখে হেঁটে যাই যেখানে শুধু তুমিহীনতা।

বাড়ির অভিমুখে কেবলি ফিরে যাই যেখানে ঘরগুলো অন্ধকার,
যেন বা জননীর চলছে ভরামাস অথচ আমি নেই গর্ভে ;
আমাকে বারবার এ ভাবে দেখা যায় যখন তুমি দাও দুঃখ,
যেন বা কালো দুধ যুগল স্তন থেকে রাতের রাস্তায় বহে যায়।

আবার ফিরে যাই একাকী শয্যায়, স্মৃতির কোলে শিশু কিমাকার ;
দুপুরে যৌবন, আবার নেমে পড়ি যেখানে বাড়ি আছে, আছে গান ;
আবার ভালোবাসি, আবার সেই তাকে, ফিরিয়ে দিয়েছে যে একবার.
আবার তারই ঠোঁটে আমার চুমোগুলো হঠাৎ হাহাকার হয়ে যায়।

আবার শিস দেয় আমাকে চিরে দিয়ে শূন্যে ভাসমান মস্ত চাঁদ,
দরোজা খুলে দেয়, মাতাল করে দেয় বুকের গহ্বরে বাড়িঘর,
আমাকে বারবার নিহত করে আর আমাকে বারবার জন্ম দেয়,
আমার জীবনের একক বৃক্ষকে আবার দেখি চাঁদ দুলিয়ে দেয়।

তবুও ভালোবেসে ভীষণ সুখ আছে, পতনে আছে তবু সিদ্ধি,
তবুও ক্ষত নেই পায়ের গোড়ালিতে তোমার কাঁটাবনে হাঁটলেও ;
তোমারই কীর্তি এ, তুমিই দিতে পারো দু'হাতে বিপরীত অর্জন—
বিষাদ ও পূর্ণিমা, তুষার ও পলিমাটি, নশ্বরতা আর নির্বাণ।

একতারাতে কান্না

জিয়া হায়দার

মিতা আমার, মিতা আমার, বলো
তোমার জন্যে কি রেখে যাই তবে,
ফাগুনবাহার নিঃস্ব, দিশেহারা
বিনিঃশেষের আগুন আমার বঁধু।

সন্ধি হলো দীর্ঘশ্বাসের সাথে
ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলাম তাই,
পথের প্রান্তে পায়ের চিহ্ন নেই
বেনামিতেই আমার পরিচয়।

পথচারী হলেম গোধূলিতে
সন্ধ্যেতারা তবুও ফুটলো না,
একতারাটি বাউরি হলো যদি
শূন্য মাঠের ক্লান্তি ভোলায় সুর।

সঙ্গী আমার অন্ধকারের প্রেম
এলেম আমি মেঘের মাদল নিয়ে,
অশ্রু আমার শ্রান্তি ভুলে প্রীত
তোমার কান্না ঢাকতে পারি যদি।

কান্না তোমার রুদ্ধ যদি হয়
পান্না মানিক ঝরতে পারে হেসে,
আমার বাউরি একতারাটি, আহা,
শূন্যমাঠের আগুন বুকে নিয়ে

ভুলতে পারে সকল অভিজ্ঞতা,
যন্ত্রণার ই স্বাতী-অভিজ্ঞান,
অতীত এবং মানসচেতনা
স্মৃতিটাকেও পুড়িয়ে দিতে পারে।

মহাভাদর একান্ত আত্মীয়
নাগরালি বসন্ত কোনোদিন
হঠাৎ ভুলেও নয় যে কোজাগরী
তোমার কথা বন্ধ-ঝিনুক তাই।

মাদক-সাকী গন্ধ-কেয়া রাতে
তোমার কথা হলেও কনকচাঁপা
মাতাল বাতাস বলবে নাকো ঘুরে
এলেম প্রিয়-মধুর-ভাঁষিণী।

পান্না মানিক শুক্তি-মণি তোমার
তুলেই রাখো ফাগুন প্রত্যাশায়
আমি তখন আগুন হয়ে জ্বলে
তোমায় বিনে হবো নিখাদ সোনা।

নিয়ে গেলেম পথচারীর ব্রত
ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে আজ,
নিয়ে গেলেম অন্ধকারের প্রেম,
সঙ্গী আমার অন্তরালের মেঘ।

মিতা আমার, মিতা আমার, নীলা,
তোমার জন্যে কি রেখে যাই, বলো,
কেবল আছে ক্লান্তি-সুরে কাঁপা
কান্না-বাউল শাওন-একতারা।

গালিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

যখন তিনি থাকবেন না তখনো মেয়েরা অষ্টাদশী হবে
এই কথা ভেবে গালিব খুব কষ্ট পেয়েছিলেন ;
এবং তিনি স্বর্গে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন এই অজুহাতে-যে
সেখানে কোনো যুবতী হুরী নেই
সকলেরই বয়স হাজার বছর।

মৃত্যুর পরে আল্লাহ্ যখন তাকে তিরস্কার করবেন
যাবতীয় পাপের জন্যে
তখন গালিব স্থির করে রেখেছিলেন, বলবেন :
হে প্রভু, যেসব গুণাহ এখনো করতে পারিনি
তা করার জন্যে আমাকে আরেকবার পৃথিবীতে যেতে দিন।

গালিব আমার প্রিয় কবি
এবং সেজন্য সবসময় বড়ো লজ্জার ভেতরে থাকি
কেননা আমি কখনোই তাঁর মতো
সাহসী হতে পারবো না।

একলা ভালোবাসি

ফজল শাহাবুদ্দীন

বৃক্ষ শাখে নতুন পাতা
চুলের মধ্যে ফুল
সুন্দরী তোর মনের মধ্যে কিসের তীক্ষ্ণ হুল

সুন্দরী তোর চোখের মণি
কিসের মুগ্ধতায়
বন থেকে ওই বনান্তরে
ঘুরছে অসহায়

জলের মধ্যে হাওয়ার গতি
শব্দ হয়ে বাঁচে
সুন্দরী তোর চোখের পাতা
যেমন ক'রে নাচে

ঝড়ের মতো শব্দ ওঠে
নিতম্ব আর বুকে
ভালোবাসি সুন্দরী তোর
গভীর চক্ষুকে

হাতের মধ্যে মুখের মধ্যে
স্পর্শ দিয়ে যাস
ভালোবাসি সুন্দরী তোর
শরীরী উদ্ভাস

পথের মধ্যে পথের ধারে
উঠছে বেজে বাঁশি
সুন্দরী তোর সব কিছুকে
একলা ভালোবাসি

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে
তীক্ষ্ণ ধাবমান
সুন্দরী তোর রক্ত জুড়ে
আমার নভোযান

নদীর বুকে কল্লোলিত
বাতাস ভরা মোহ
সুন্দরী তুই অরণ্যেতে
পাতার সমারোহ

তোর সে চিরদিনের দেহ
বাজছে রিনিঝিনি
সুন্দরী তুই স্বপ্নে আমার
বিশাল পক্ষিণী

সুন্দরী তুই তীক্ষ্ণ এক
ধ্বনির সঙ্গীতে
আমার হাতে উদ্বেলিত
গ্রীষ্ম আর শীতে।

প্রথম যৌবন

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

[লাজ-রক্তা হইল কন্যার প্রথম যৌবন]

—মৈমনসিংহ গীতিকা

আজ তার স্বপ্ন নেই। অথচ স্বপ্নের তরণীতে
ভেসেছে হাওয়ার পালে, অমন্যা সে কতো রাত্রিদিন
গেছে দূর-দূরান্তের দ্বীপে ;
যেখানে গোধুলি-লগ্নে শব্দহীন সঙ্গীতের মতো
দু'চোখের পাতা বেয়ে নেমে আসে অবিশ্রান্ত ঘুম,
যেখানে পরীর মতো গেছে একা একান্ত নিভৃতে
সে-দেশে সবুজ দ্বীপে স্বপ্ন তার হয়েছে বিলীন।

সেখানে একাকী যেয়ে বাকাউলি পরীর মতন—
দেখেছে, মহলে শুয়ে শাহজাদা, অপরূপ তা'র
উজ্জ্বল দেহের রঙ গোলাপী আলোর মতো জ্বলে
মর্মর-খচিত সেই মহলের স্তব্ধ অন্ধকার—
সে-রূপের ছোঁয়া লেগে একটি মুহূর্তে যায় টুটে!
নিজেকে শাহেরজাদী ভেবে সেই দ্বীপের ভিতর
কাজল-রেখার মতো তা'র

দু'টি কালো টানা—চোখে যতবার দেখে নিতে পারে
দেখেছে দু'চোখ ভ'রে, চোখ খুলে শাহজাদা যেই
তাকিয়ে দেখেছে তা'কে—তখনি সে-ম্লান অন্ধকারে
ছায়ার আড়ালে যেয়ে লুকিয়েছে মুখ।
দুরন্ত যৌবন তা'র লাজ-রক্তা, আপেলের মতো—
সারাদেহে ছড়ায়েছে রক্ত-রেখা, একটি নিমেষে
দু'চোখে তাকাতে যেয়ে বার-বার হয়েছে আনত
রূপসী নারীর মুখ ;

অবশেষে শাহ্‌জাদা হেসে
ঘুম-ভেঙে উঠে এসে কাছে টেনে নিয়ে গেছে তা'কে
বলেছে অনেক কথা সেই রাত্রি গভীরে একাকী ;
        যখন দেখেছে আর রাত নেই বাকি
সে-নারী আবার তার কল্পনার পাখা মে'লে দিয়ে
        সে-রাত্রির স্বপ্নের ভিতর
        ঘুম ভেঙে খুঁজে পায় ঘর।
এমন সবুজ দ্বীপে স্বপ্নে কতো উ'ড়ে গেছে একা,
ঘুম-ভেঙে বিছানায় দেখেছে সে ঘন অন্ধকার
আজ আর স্বপ্ন নেই। নেই তার স্নিগ্ধ রূপ-রেখা
এখন হাওয়ার পালে যায় না সে দূর-দেশে আর।

প্রতিতুলনা

আল মাহমুদ

আমার উদ্ভাবনার টেবিল জুড়ে তোমার আনাগোনা। আঙুল
নড়ছে আর ফুটো হয়ে যাচ্ছে উপমা। আমি পারি না
তবুও চায়ের কাপের সাথে, পারি না, তবুও ফুলদানীর কাছে
সিদ্ধ ডিমের সাথে তোমার মুখকে রাখলাম।

মাংস রান্না হচ্ছে, শিশুদের চোখে খুশী। বলবো না যে
গ্যাসের নীলাভ শিখার সাথে তোমাকে এক করা যেতো।
নদীর সাথে ? না। পাখি কিম্বা গোলাপও নয়।
তার চেয়ে এসো শো-কেসে মদিনার কাসার কারুময়
পাত্রটিতে তোমার ভেজা মুখকে সাবধানে বসিয়ে দিই।

সমুদ্রের কথা আমি কেন ভাবতে যাবো। কেন বলবো যে
পুঞ্জীভূত মেঘমালা তোমাকে অতিক্রম করে গেলো।
কেন যাবো উত্তরের বাতাস দক্ষিণে ফিরিয়ে আনতে, না।
দেখো একটি বিমান মেঘের নির্লিপ্ততাকে ছাড়িয়ে
রানওয়ের দিকে কাত হয়েছে। তোমার বাঁকানো
গ্রীবাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়। যায় নাকি ?

একদিন দিল্লীর পুরানো কিল্লার মস্তক ছুঁয়ে
সূর্য ডুবে গেলে আমি খাঁটি বিদেশীর মতো আকাশের
লাল আভাকে রক্তের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম।
এখন এই বৈদিক বর্ণচ্ছটাকে কি করে বলি যে
নারীর কণ্ঠদেশ হও ?

সৈকতের স্নানে

মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান

(তোমাকে পারিনা ছুঁতে—ফিলিস থমসন)
তোমাকে পারিনা ছুঁতে, তুমি নেই এখানে এখন
আমার শরীর নিয়ে আমি কি যে করি
জ্বলন্ত সূর্যের নীচে ঘুম ঘুম উজ্জ্বল সৈকতে
নতমুখ। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায় বালি।
ভাবি না তোমার কথা, ভাবব না ভাবি
(তা কি হয়!)
চোখে বেঁধে বালিরেখাকীর্ণ জল তটভূমি জুড়ে
ভাঙছে মাইল, মাইলের কথা শুধু ভাবি আমি।
এখানে সে আলো নেই যে আলো তোমার কাছে অবিশ্রাম
ঝরছে এখন। চাঁদের সমান রূপো আমি ঢালি
তোমার শয্যায় মনে মনে। স্বপ্ন ধোঁয়া অনাবিল
যেন নীল ঠান্ডা রঙ, প্রতি মুহূর্তের ব্যবধান।
এখানে তুমি তো নেই, এই বালি আঙুলে, শরীরে,
পিঠময় সূর্যের আদর।
কতপথ পার হয়ে
ছুঁয়েছি তোমাকে এক সমুদ্র আলোয় মনে পড়ে,.
প্রথম দেখার দিনে স্বপ্নঘোর ছিল দুই চোখে;
কম্পমান ছিল হাত, বুক ঢাকা ছিল কি জ্যোৎস্নায়।
এখন সে ভয় নেই, তবু আছে বিস্ময় প্রচুর।
প্রেমের সারাৎসারে প্রেম থাকে বেঁচে।

আমার দু'হাতে তুমি কত পরিচিত, স্পন্দমান,
যেন ভাবামাত্র আমি তোমাকেই ছুঁই, ছুঁতে পারি।
কিন্তু এখানে শুধু ঢেউ আর বালি।

কেমন সমুদ্র দোলে, বাহুতে লবণ জমে, চারদিকে
জলজ সুনীল শুধু প্রদীপ্ত গড়ায়, ভাঙে কূলে
সেই ধ্বনি শুনি, কানে প্রবল কল্লোল; ঢেউ ফুঁড়ে
যখন আমার দেহ জেগে ওঠে ঢেউএর ওপরে,
ভাসে, ভাবে, ভাবে জল, সমুদ্র কোমল জল ওঠে পড়ে,
সূর্য, বাতাসের তাপ দীপ্তি, লোনাজল দেহ ঘিরে
নিরাপদ সৈকতের স্নানে, মনে হয় এই নুন
ঢেউ তাপ বালি হয়ে ঘিরে আছ আমাকে তুমিই।

কখন তোমার হৃদয় সমুদ্রে ?

দিলওয়ারা

এইতো সময়,
এসো বেরিয়ে পড়ি। ছড়িয়ে যাই
যেখানে দুচোখ যায় তারো চেয়ে সুদূরে কোথাও
দেখলেতো, ক্যামন অলৌকিক পার্থিব প্রজ্ঞায়
মঙ্গলগ্রহে ভাইকিং-এক।

জেনোসাইড ইকো অথবা বিকোসাইড
আসল এবং কৃত্রিম ধ্বংস সাধনের
প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী হও ক্ষতি নেই।

হ্যানিবলের রণহস্তিরা বিভিন্ন রূপে সম্মুখে এগোচ্ছেই।

তোমার সঙ্গে বাগানে যাবো
তোমার সঙ্গে সুরভি হবো, কথা ছিলো,
আমি ধরেই নিয়েছিলুম
তুমি আমার সমকালের নেফারতিতি ;
এবং তোমার সৌভাগ্য হলো এই
তোমার তনুশ্রীর কোথাও নেই
কোনো ফ্যারাও এর মমীতঞ্চু নখের আঘাত,

এইতো সময়,
এসো বেরিয়ে পড়ি।
না হয় ঘুরে আসি নাগাসাকি অথবা হিরোসিমা,
নিখুত বৈজ্ঞানিক ধ্বংসলীলার জন্যে
একটি অনুপম নোবেল প্রাইজ দরকার।

একী তোমার সুচারু বুক দুলছে কেনো ?
ফুলছে কেনো ?
হায়, কখন তোমার হৃদয় সমুদ্রে
আণবিক অস্ত্রসজ্জিত নৌবহরের সমাবেশ ঘটলো ?

আমাদের শূন্য ঘরের শূন্যতায়

বেলাল চৌধুরী

কুয়াশার মতো নৈঃশব্দ এসে
বাঁধে নিবিড় কঠিন বন্ধনে ;
আমাদের শূন্য ঘরের শূন্যতায়
এখন শুধু প্রজাপতি পাখনার অস্থির শিহরণ!

পারস্পরিক স্পর্শের নীরবতা হয়ে ওঠে একটি শরীরী ব্যঞ্জনা,
তপ্ত ওষ্ঠ-ব্রেল পদ্ধতি বাজে স্নায়ুতন্ত্রীতে,
বেপথুমানা রাত্রি এখন নীল নভতলে
চোখজোড়া আরো উসকে তোলে অন্ধকারকে।

দীর্ঘ পথযাত্রা শেষে পায়ের পাতায় ফোস্কা,
অশ্রুবিন্দু কি শীতল করতে পারে জলন্ত ত্বককে ?

একদিন একটি লোক

ওমর আলী

একদিন একটি লোক এসে বললো, 'পারো ?'
বললাম, 'কি ?'
'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতে,' সে বললো আরো,
'সে আকৃতি
অদ্ভুত সুন্দরী, দৃপ্ত, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে—
পেতে চাই নিখুঁত ছবিতে।'

'কেন ?' আমি বললাম শুনে।
সে বললো, 'আমি সেটা পোড়াবো আগুনে।'

রিরংসার মতো, কিংবা

হায়াৎ মামুদ

রিরংসার মতো আরো কিছু থেকে যায়
দৃষ্টিতে দেহত্বকে রঞ্জিত নখে,
কথা থাকে নিঃশ্বাসে, পোশাকের ঘ্রাণে ;
শুধু কিছু কথা, ভেনেরিস, তুষারঝটিকায়
হা-হা শ্বাসে উড়ে যায় চন্দ্রিমার দিকে।

জানালার হিম-পাওয়া সাদা ঘষাকাচ—
নখ খুঁটে তুলে ফেলে বরফের বালি
চোখ রাখো সেখানেতে ; কিসের দীপালি
খেলে মুখে, কার স্মৃতিকণিকার আঁচ ?
কবেই মুছেছে তাকে সময়কর্ণিকে।

তোর মুখে দেখি স্মৃতি কালের কামড়
অসময়ে রাখে দাগ, ভেনেরিস, হাত ছুঁই হাতে,
বসে আছি মুখোমুখি—সিগারধোঁয়াতে,
পাত্র খালি, মোট্‌সার্টে বেহালার ছড় ;
এ কেমন বসে থাকা বাস্তবে অলীকে ?

অষ্টাদশী বুকে তোর ঝরে পাতা, ঝরে,
হেমন্তী বাতাসে ওড়ে সোনালি-লোহিত,
বয়সের হিম কুচি কাঁপায় শোণিত,
ঢাকে জমি শরীরের—মরে, কথা মরে :
রেশ শুধু গ্রীবাভঙ্গে ওষ্ঠে কনীনিকে।

শুধুই বসে থাকা, ভেনেরিস, আর কিছু নয়—
চাঁদ ও তুষারে চলে অন্তহীন খেলা ;
রিরংসার মতো, কিংবা আরো গাঢ়ময়
কথা মেশে ঈথারেতে। আমরা একেলা।

অভিমানী খাম

খালেদা এদিব চৌধুরী

ভুল চিঠিটা কোথায় গেল ? তৃষ্ণা তুমি কী জানো ?
তোমার হৃৎপিন্ডে জোড়া সাপ নেচে ওঠে
অভিমানী খামটা খুলে দেখলেনা কী আছে সেখানে
রাত্রির কামের গন্ধ, বিষ ভালোবাসা।
তবু তুমি জানাওনি কেন ?
এখানেও রতি বাসনার ফুল ফোটে
ঠিকানার বদলে হৃদয় লেখা হয়ে যায়।

ভেবেছিলাম তোমার দুয়ারে চিঠির বাক্স খোলা হবে
কেউ কেউ ভুল করে
ঘরবাড়ি খোলা—জানালা বন্ধ থাকে ;
আমাদের হবেনা বাসরের শয্যা পাতা—
বার বার তোমার চোখের মণি খেয়ে ফেলে বেদনার নীল
ভুল চিঠিটাই অবশেষে অভিমান নিয়ে গেলো।
কোথায় গেল ক্ষত চিহ্ন নিয়ে!
তোমাকে খুঁজে খুঁজে ফিরে আসে বিদীর্ণ ভালোবাসা
খাম খুলে দেখি চোখ জোড়া ঠিক আছে
অথচ যায়নি তোমার কাছে বলে তুমি
পাখিদের ডানা হ'তে খড়কুটো ছিঁড়ে ফেলো।

বেদনার ক্ষত নিয়ে ফিরে আসে ভালোবাসা
দরোজার নীল পর্দা উড়ে না—বাসরের চির অহংকার
ভুল চিঠিটা কোথায় গেল
অভিমানী মন নিয়ে। ক্ষত নিয়ে!
তুমি কী জানোনি ?
দেখোনি প্রেম ঠুকে খেয়ে ফেলা সবুজ টিয়ার ঠোঁট ?

পাতারা নড়ছে হাওয়ায়
বিষটুকু পড়ে আছে, কথা নেই
শুধু আমি আজ বাসনার জরাজীর্ণ প্রতীক স্বপ্ন।

জলের ভেতর

মনজুরে মওলা

আমি জানি, সব সিন্ধু পার হ'য়ে তুমি চ'লে যাবে।
ঢেউয়ের উপর দিয়ে চ'লে যাবে ঢেউয়ের মতন ;
ঢেউয়ের আড়াল হ'য়ে চ'লে যাবে আলোর মতন ;
ঢেউয়ের গভীর জুড়ে দুলে উঠবে সমুদ্রের মতো।
সমস্ত আকাশ জুড়ে হাতুড়ির শব্দ জেগে ওঠে—
যেন ভেঙে যাচ্ছে নীল, যেন হীরা, সব রত্নরাজি
মুহূর্তে হারালো দ্যুতি, টুকরো হ'য়ে গেলো।

জানি, কিন্তু মানি না কখনো।
তোমার চুলের মধ্যে আলো হ'য়ে বেঁচে থাকতে চাই ;
তোমার হাতের মধ্যে সৌভাগ্য-তারকা হ'তে চাই ;
তোমার দৃষ্টির মধ্যে মেঘের অতীত মেঘ
বৃষ্টির অতীত বৃষ্টি
স্বপ্নের অতীত স্বপ্ন
ফুটে থাকতে চাই।

আমি জানি, তুমি চ'লে যাবে।
সব সিন্ধু প'ড়ে থাকবে, যেন এই বুকের ভেতর
নারকেল গাছ আছে, পাতায় শিশুরা আছে,
একাত্তুর গুলি করছে পাতার ভেতর।
তুমি কি তোমার রঙ, চেয়ে-দেখা, ইজেল ও তুলি
সঙ্গে নিয়ে যাবে ?

তোমার বুকের মধ্যে বারুদের মতো আমি জ্বলে উঠতে চাই ;
বিস্ফোরণে ভেঙে যাক ঘরবাড়ি, বাঁধ টুকরো হোক ;
প্রবল বন্যায় নদী কেড়ে নিক গ্রাম।

আমি জানি, ভুল ঘরে চ'লে যাবে তুমি।
সমস্ত আকাশ জুড়ে জেগে উঠবে প্রবল হাতুড়ি।
তোমার মুঠোর মধ্যে সৌভাগ্যের চিহ্ন হবো আমি—
ঘরের ভেতর আমি একমাত্র ঘর,
জলের ভেতর একা পিপাসার অফুরন্ত জল।।

নারীরা ফেরে না

অরুণাভ সরকার

যাওয়া ব'লে কিচ্ছু নেই, সবই ঘুরে-ফিরে আসা
শূন্যতায় মাথা কুটে ফিরে আসে সমস্ত সংলাপ
সব শীৎকার, চিৎকার
বিশাল রণপা-য় চেপে
        প্রাচীন গোধুলি ফিরে আসে,
নীলিমা-ভ্রমণ শেষে ঘরে ফেরে পাখি ;
নদী, তারও গতি নয় শুধুই সাগরে
সেও মেঘে-মেঘে ঝর্ণার নিকটে ফিরে যায়।
শুধু
একবার চ'লে গেলে
        নারীরা ফেরে না।

কৃষ্ণ এখন

মোফাজ্জল করিম

তোমার সঙ্গে প্রেম করতে বলো
অথচ যখন তোমাকে আমি বলি
বিকেলটা আজ গল্প করেই কাটাই,
তুমি বলো, রাধা আমার রাধা,
বিকেলটা যে কারখানাতেই বাঁধা।

আমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাও
অথচ যখন ঘরের পথেই চলি
তুমি তখন ব্যস্ত হয়ে ওঠো
ত্রস্ত পায়ে রেশন তুলতে ছোটো।

আমি বললাম, রাতটা শুধু রেখো
আমার জন্যে বাঁচিয়ে রেখো সখা,
তুমি বললে, রাধা আমার রাধা,
কারখানার ওই চিমনিটাকে দেখো।

পষ্টাপষ্টি জানতে যখন চাই
আমার জন্যে একটুখানি সময়
দিতে তোমার কেন এতো বাধা,
তুমি বলো, রাধা আমার রাধা,
জীবনটা যে তিন শিফটে বাঁধা।

কৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ শোন আজ
মুরলী বাঁশি কারখানার ওই ভেঁপু,
তাই তো এখন প্রাণের যমুনায়
ড্রেজার চলার শব্দ শোনা যায়।

চলে যাবে-যাও

আন্ওয়ার আহমদ

চলে যাবে-যাও, স্বাভাবিক চলে যাওয়া—
গাছ থেকে পাকা আম খসে পড়ে, অশ্রুও ঝরে যায়
সাপের খোলস, পাখির পালক—সবই
নিয়ম মাফিক ঝরে যায়, চলে যায়
জরা আর ব্যাধি, অসুখ-বিসুখ, কান্নার দোলাচল
স্মৃতির পাত্রে থাকে শুধু অবশেষ।

চলে যাবে-যাও, যাওয়াটাই স্বাভাবিক
স্রোতের আঘাতে ভেঙেছে নৌকা, আমি ডুবে যাই ধীরে
ব্যাকুল আঙুল আশ্রয় খোঁজে, হাত খোঁজে দ্বিধাময়
শূন্যতা তাকে ব্যর্থতা দেয় শুধু।

ডুবে যাই আমি, ছেড়ে যাই এই নাগরিক লোকালয়
ইশারা কোথায় ? তোমার গায়ের চিহ্ন তা ধরে রাখে ;
চলে যাই, যাবো, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে চেনা স্মৃতির কড়ে আঙুল।

তোমার আঁচল, কাজলের রেশ, দাঁতের তীক্ষ্ণ দাগ
বলবে, আমাকে ভালোবেসেছিলে তুমি।

সাকিন

শামসুল ইসলাম

'এই আছি আর এইতো নেই'
বললে এসে যেই,

তাকিয়ে দেখি আকাশ গঙ্গা
জল এঁকেছেন চতুরঙ্গা।

তোমার স্থায়ী সাকিন অনন্তেই॥

আজ সারাদিন

শহীদ কাদরী

বাতাস আমাকে লম্বা হাত বাড়িয়ে
চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঘুরে বেরিয়েছে আজ সারাদিন
কয়েকটি লতাপাতা নিয়ে
বিদঘুটে বাতাস,
হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে আমাকে,
লাল পাগড়ি-পরা পুলিশের মতো কৃষ্ণচূড়া
হেঁকে বললো :
"তুমি বন্দী"।

আজ সকাল থেকে একজোড়া শালিক
গোয়েন্দার মতো আমার
পেছনে পেছনে ঘুরছে
যেন এভিনিউ পার হ'য়ে নির্জন সড়কে
পা রাখলেই আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবে ঠিক।

"তুমি অপরাধী"
এই কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যেন
ব'লে গেল বজ্রসহ এক পশলা হঠাৎ বৃষ্টিপাত—
"তুমি অপরাধী—
মানুষের মুখের আদলে গড়া একটি গোলাপের কাছে"।

বৃষ্টি-ভেজা একটি কালো কাক
একটা কম্পমান আধ-ভাঙা ডালের ওপর থেকে
কিছুটা কাতর আর কিছুটা কর্কশ গলায়
আবার ব'লে উঠলো : তুমি অ প রা ধী।

আজ সারাদিন বাতাস, বৃষ্টি আর শালিক
আমাকে ধাওয়া ক'রে বেড়ালো
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত
তোমার বাড়ির
কিন্নরকণ্ঠ নদী অবধি আমি গেলাম
কিন্তু সেখানে ঘাটের ওপর এক প্রাচীন বুড়ি
সোনার ছাই দিয়ে ঘটি-বাটি মেজে চলেছে আপন মনে।

একটা সাংঘাতিক সূক্ষ্ম ধ্বনি শুয়ে আছে
পিরিচে, পেয়ালায়
ঐ বাজনা শুনতে নেই
ঐ বাজনা নৌকোর পাল খুলে নেয়
ঐ বাজনা ষ্টীমারকে ডাঙার ওপর আছড়ে ফ্যালে
ঐ বাজনা গ্রাস করে প্রেম, স্মৃতি, শস্য, শয্যা ও গৃহ

তোমার বাড়ির
কিন্নরকণ্ঠ নদী অবধি আমি গিয়েছিলাম।
কিন্তু হাতভর্তি শালিকের পালক
আর চুলের মধ্যে এলোপাথাড়ি বৃষ্টির ছাঁট নিয়ে
উল্টো-পাল্টা পা ফেলে
তোমার দরোজা পর্যন্ত যেতে ইচ্ছে হলো না।

ঐ শালিকের ভেতর উনুনের আভা, মশলার ঘ্রাণ।
তোমার চিবুক, ঝুটি আর লালচে চুলের গন্ধ,
ঐ বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে পাতা আছে তোমার
বারান্দার চেয়ারগুলো
তাহলে তোমার কাছে গিয়ে আর কি হবে!

আজ সারাদিন একজোড়া শালিক
গোয়েন্দা পুলিশের মতো
বাতাস একটা বুনো একরোখা মোষের মতো
আমাকে ধাওয়া করে বেড়ালো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত

আমি অনেকদিন পর একজন হা-ঘরে
উদ্বাস্তু হ'য়ে চরকির মতো গোটা শহর ঘুরে বেড়ালাম।

বাঘিনীর প্রেম

সিকদার আমিনুল হক

বাঘিনী নিয়েই খেলা, নাম ভালোবাসা
কত তার কষ্ট
সংগ্রহ কেবল বুকে মান্ধাতার আশা
বিবেচনা নষ্ট।

অথচ ভারিও খুব, 'নিষ্পলক কাঁটা—
বিষবাষ্প মূলে ;
এত জেনে ছাড়ো নাকি ? নাও কি ছুটিটা
চল্লিশ পেরুলে ?

বুকের উজ্জ্বল রক্তে আচম্বিতে শীত
ঘৃণা সহনীয়
এ-ছাড়া গুমোট লাগে যৌবনের জিৎ
আয়ু অভাবনীয়।

কেউ তো ওঠে না শীর্ষে, শুধু প্রেমে পড়ে
নির্ঘাত পতন
চিরুনি চুলের কাঁটা কত নড়বড়ে
আর সাধারণ!

তবু কি বলেছি তুচ্ছ, অদ্রষ্টব্য ?—জানি
মোহ ক্রীতদাস
প্রিয় হাত মুছে দেয় জিনিসের গ্লানি
চির বারোমাস।

প্রয়োজন থাকে প্রেম, থামে ওষ্ঠে গিয়ে
স্তনেও কখনো ;
নিতান্ত নিরীহ কেউ, খেলি তাকে নিয়ে
বিপদ তখনও।

দারুণ ঠুনকো সখে আবর্জনা বাড়ে
জড়ো করি যতো,
পতঙ্গ লুকোয় ঘাসে, তুমি অন্য ঘরে
অন্যদের মতো।

তোমাতেই

হায়াৎ সাইফ

অনেক নামের থেকে ছেঁকে নেয়া নির্যাস একটি সর্বনামে অর্পিত তুমি
তোমার ভালবাসার মধ্যে সংগীত সুষমা চিত্রাবলী বর্ণের বৈভব ও প্রমিতি
এবং তোমার অভাবে কোন বিশেষ্য নেই কোন সর্বনাম নেই কোন বিশেষণ নেই
আছে কেবল সর্বব্যাপী সর্বভুক অব্যয় শূন্যতা এবং তার ভেতরে নৈরাশ্য ও যুদ্ধ
একদিন যুদ্ধে গিয়ে তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম পরম সহিষ্ণুতায়
নিদারুণ কষ্ট যন্ত্রণা ও ভয়াবহতার ভেতর থেকে যেন প্রস্ফুটিত হয়ে
উঠেছিল তুমি
এবং সেই প্রার্থনার ও প্রস্ফুটনের লগ্নে আমার সমস্ত অস্তিত্ব সমস্ত
বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা
সেদিন পরিণত হয়েছিল একেকটি লক্ষ্যভেদী বুলেটে
তীব্র গতিতে শিস দিয়ে বিঁধেছে সেই অগ্নিশলাকা তার প্রার্থিত লক্ষ্যে
আর নিজের হৃদয়ের রক্ত দিয়ে রচনা করেছি
একেকটি প্রজ্জ্বলিত ছবি তোমার অনেকান্ত অবয়ব

আজকে আর তোমাকে আমি এককভাবে দেখতে পাই না

কিন্তু সেই অবয়ববিশ্লিষ্ট তুমি এখন কেমন করে যেন
তোমাতেই অর্পিত হও ভুরুর বাঁকে গ্রীবার ঔদ্ধত্যে
বাহুর স্রোতধারায় সুমিত জঙ্ঘার দোলাচলে
পদপ্রান্তে পড়ে থাকা স্খলিত অঞ্চল
সুস্মিত রক্তলাঞ্ছিত নখাগ্রে চম্পক অঙ্গুলিতে
নিবিষ্ট অধরে ব্রীড়ায় আনতনেত্রে তুমি কি
একান্তই নির্মোহ বঙ্গদেশের প্রকৃষ্ট ভৈরবী
আমার বেদনার্ত হৃদয়ের সমস্ত উন্মাদনা
আমার সামগ্রিক অস্তিত্ব মনন ও মানস ?

উত্তরকালের চিঠি

আল মুজাহিদী

আগামী কালের চিঠি রেখে গেলো
আমার মনস্তাপ—
লেফাফার ভাঁজ খুলে দেখে নিয়ো
কালো হরফের ছাপ।
কালো হরফের কালসিয়া দাগে
পড়েছে অনেক ক্ষত,
তিল তিল করে গড়েছে আয়ত
আতশী ভবিষ্যৎ।
সীলমোহরের তলায় রয়েছে
গভীর যে যন্ত্রণা,
ডাকহরকরা হয়তো বা জানে
ভেতরে কী জলকণা।
বিষমদৃশ্য জীবন যেখানে
বলো, কে কতটা দায়ী
জলবিষুবের বুদবুদগুলো
কতো দীর্ঘস্থায়ী?
সুদূর আকাশে মরুবন থাকে
শূন্যের 'ওয়েসিস'
বুনোচাতকেরা খোঁজে সে ছায়ার
বিম্ব অহর্নিশ।
আগামী কালের চিঠিতেই পাবে
হৃদয়ের গূঢ় কথা,
জীবন তো নয় অলীক ধ্রুপদ
মায়াবী প্রগলভতা।

পাথরের ভাষা মর্মবস্তু
পাঠ করে দেখেছো কি
ঝরণাতলায় দাঁড়িয়ে রসিক
করো নাকো বুজরুকি।
মিথ্যে কুহকে কেটে গেছে কতো
সোনালী প্রহর, কাল
আমি মৃতপ্রায় আমার কাঠামো
জেগে আছে কংকাল।
তবুও জীবন ভালোবাসি যাকে
আলোর নিরিখে সঁপি,
রেশমি গেলাফে ঢেকে রাখি তাকে
অমূল্য আশরফি।
আয়রে জীবন নেচে ধেয়ে আয়
আয়ুষ্য দোলাচল ;
কানের ভেলায় ভেসে ভেসে আয়
কারুকৃত মঙ্গল।

আমার অভিধান

রফিক আজাদ

আমার নিকট তুমি এক মূর্তিমান অভিধান :
খুচরো অথবা খুব দরকারি ভারি শব্দাবলি
টেবিলে ঈষৎ ঝুঁকে নিষ্ঠাভরে যে-রকমভাবে
দেখে নিতে হয়, প্রয়োজনে তোমাকে তেমনি পড়ি।
তুমিই আমার হও বিশ্বাস-স্থাপনযোগ্য সেই
বিশুদ্ধ মৌলিক গ্রন্থ : তোমাকে পড়েই শিখে নিই
শব্দের সঠিক অর্থ, মূল ধাতু, নির্ভুল বানান।

তোমাকে দেখেই জেনে নিই কোন ঠিকানায় আছে
সুন্দরের ঘরদোর ;—বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিরুদ্ধে
কি-কি অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন, তা-ও জানা হয়।

তোমার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মুহূর্তেই শেখা হয়
কবিতায় ব্যবহার্য সমস্ত ছন্দের মূলসূত্র।
এজন্যে আমাকে কোনো প্রবোধচন্দ্রের গ্রন্থাবলি
কোনোদিন পড়তে হয়নি—এবং একথা সত্য,
পড়বো না—যতোদিন নৃত্যপর নারীর শরীর
আমার চোখের সামনে প্রকৃতির মতো র'য়ে যাবে।

হরিচরণের কাছে, আপাতত, কোনো ঋণ নেই :
যতোদিন পৃথিবীতে তোমরা রয়েছো, ততোদিন
প্রয়োজন নেই কোনো ব্যাকরণ কিংবা অভিধানে ;
সত্যি কথা বলতে গেলে, এমনকি দরকার নেই
কোনো ফুলে। কেননা, নারীর নগ্ন শরীরের মতো
ঘ্রাণময় ফুল আমি এ-জীবনে কখনো শুঁকিনি।
যে সৌগন্ধ্য রয়েছে নারীর—সে-রকম গন্ধবহ
ফুলের সাক্ষাৎ আমি এখনো পাইনি কোনো ফুলে।

আমার হাতের কাছে সর্বদা সরল শব্দকোষ
হ'য়ে আছো, আজীবন। যদি বা দৈবাৎ প'ড়ে যাই
দুর্বোধ্য, অপরিচিত, রুক্ষ শব্দাবলির সম্মুখে—
স্বভাবত, তোমাকে দেখেই সাহস সঞ্চয় করি।

সুন্দরের দিকে রয় আমার প্রধান প্রবণতা ঃ
তোমার শরীর হয় কবিতার পবিত্র পুরাণ,
গরীবের কানাকড়ি, বিধবার শেষ শাদা শাড়ি।।

মানুষটি যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে

রবিউল হুসাইন

শূন্যে উড্ডীন একটি জমাট-বাঁধা কাচের
ডানাহীন বাক্সে একশ' বায়ান্নো মন তেঁতুল
আর উনপঞ্চাশটি নারী গলায় শাড়ী পেঁচিয়ে
উলঙ্গ আকাশ থেকে ঝুলছিলো—
আমি মাঝে মাঝে এরকম স্বপ্ন দেখি,
অবশ্য আমার এই স্বপ্নের কথা শোনা বা
না শোনাতে কারো কিছু যায় আসে না, আমারো।

অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি, দশটি আঙ্গুলের
মাথায় স্বাভাবিকভাবে জমা নখের ভেতরের
ময়লাই একটি মানুষের দৈনন্দিন অক্ষয়
ও খাঁটি সঞ্চয়, অন্য কিছু নয়,
প্রতিদিন আমি সেই গতদিনের প্রকৃত সহজ
ও মহামূল্যবান পুঁজি ব্যাংকে জমানো
টাকার মতোন ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে খাই।

রাতের আকাশ কালো কাগজের
এক বিশাল একপৃষ্ঠার বই,
তারা ও নক্ষত্রেরা সেই বইয়ের
উজ্জ্বল অজর অক্ষর,
আমি সেই বই পড়তে পারি,
জীবনের মতোন ওই বইয়ে সবই আছে,
কিন্তু কোনো কবিতা লেখা নেই।

যে মানুষ গ্রামে থেকে কোনোদিন
ষাঁড়ের গুঁতো খায় নি,
সে মানুষ এখনো গ্রামে বাস করার
আসল মজা টের পায় নি ;
যে মানুষ শহরে থেকে কোনোদিন
মটর গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে
প্রাণে বাঁচে নি,
সে মানুষ এখনো শহরে বাস করার
আসল মজা টের পায় নি ;
সেরকম, যে মানুষ কোনোদিন
ভালোবাসাহীন জীবন পায় নি,
জীবনে সে কোনোদিন বেঁচে থাকার
আসল স্বাদ খুঁজে পায় নি।

যে লোক দিনে ঘুমোনোর জন্যে
অঢেল সময় ও সুযোগ পায়
তাকে আমি হিংসে করি,
যে লোক রাতে না ঘুমিয়ে জেগে থাকে, তাকেও,
কেননা, তারা এক বিরল বোধের ভেতরে
যাওয়া-আসা করতে পারে,
যা অন্যেরা পারে না।

যে মানুষ এখনো মানুষের ভালোবাসা পায় নি,
সেই মানুষের এখনো মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে,
কারণ, আমি দেখেছি, একমাত্র
ভালোবাসা পেলেই মানুষ
নষ্ট-ভ্রষ্ট ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

চারিদিকের ভালোবাসাহীন পরিবেশের ভেতর
থেকে থেকে কেউ যদি হঠাৎ করে
ভালোবাসা পেয়ে যায়,
তাহলে ভেতরে ভেতরে তার এক বাজে বোধ
কাজ করতে থাকে এবং তারপর থেকে
সে কতকগুলো অবাস্তব চিন্তা শুরু করে
আর ওই চিন্তাই তাকে ধীরে ধীরে
নির্জীব ক'রে তোলে, সেই সাথে
সে অনেকগুলো অসফল স্বপ্নের ফাঁদে বন্দী হ'য়ে
তার আশেপাশের মানুষ, সময় ও দৃশ্যকে
খুব খাটো ক'রে দেখতে শুরু করে এবং
এইভাবে তার পতন হ'তে থাকে।

তারপর তার চূড়ান্ত পতনের ঠিক আগ-মুহূর্তে
সে বুঝতে পারে,
জীবনে ভালোবাসা না পেলেও জীবনের কিচ্ছুটি
যায় আসে না, আর
জীবনের সাথে বাস্তবতার লেনদেনেরও
কোনো পট পরিবর্তন হয় না,
কিন্তু তখন আর সময় নেই, ভালোবাসাহীন
নিজস্ব নিয়মে জীবন ঠিকই চলেছে
আর মানুষটি যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে।

প্রশ্ন

আসাদ চৌধুরী

কোন্ ঘাসে ছিলো
দুঃখ আমার,
কোন ঘাসে ছিলো
প্রেম ?

কোথায় ছিলেন
রূপালী জ্যোৎস্না,
ঢের সূর্যের
হেম ?

কখনো স্মৃতিকে
সোনালী গীতিকে
এ-কথা বলেছি-
লেম ?

একটি জাগরণ

আবদুল মান্নান সৈয়দ

বিস্ময়, কোথায় ছিলে ?

জীবনের বাজারের পথে ভিড়ে মিশে গিয়েছিলাম একদিন,
পাজামায় লেগেছিলো ধুলো, নক্ষত্রে কর্দম,
স্বপ্নকেও ওরা বলেছিলো রাজনীতি-সচেতন হ'তে !
—এইসব দ্বিধায় ছিঁড়েছি এক সময়
রোজ-রোজ।

সহসা তোমাকে দেখে ভেসে যায় দিন-অনুদিন,
ইস্পাতের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছো প্রজাপতি,
বস্তুর ভিতর থেকে উড়ে চলো ভিতরে আমার,
উড়েছো পাথরে তুমি, উড়েছো অগ্নিতে।
বাস্তবের মৃদুতম স্পর্শে কবিতার মতো তুমি
হ'য়ে গেছো বাস্তবের পার।

অগ্নি কি বোরখা পরেছে ?
ফোয়ারা পাথর ?
—এই প্রশ্নে শুরু হয়েছিলো
ঘরে-ব'সে-থাকা আমার !

আবার রক্তিম জোশে ভ'রে গেছে
শাহবাগের মর্চে-পড়া পলাশের ডাল
ধরেছে ধাতব ঝিঁঝি পরিবাগে পাওয়ার-হাউজ,
নারীসূর্য আটকে গেছে বেদনার মেঘে আর
পরাণগুল্মোরে,
ঝরণা-কলম বেয়ে ছুটে গেছে সুন্দরের নদী,
বিল্ডিঙে লেগেছে চাঁদ,
হৃদয়ে তুলেছে তলোয়ার।

বিস্ময়,
ছিলো মাটির ভিতরে অগ্নি,

ছিলে ঝরণা বধির পাথরে
জীবনের লক্ষ্মীকুঞ্জে জ্বলে উঠলে তুমি,
ঝ'রে পড়লে জীবনের মাধবকুঞ্জের ধারা বেয়ে।

ওগো চঞ্চলতা, যতো দূরে চ'লে যাও,
এই কবিতায় তুমি এলোমেলো স্থাপত্য মেনেছো।

কোথাও কি বৃষ্টি হ'য়ে গেছে?
—এখানে উঠেছে রামধনু।।

কবিতা/৮

মোহাম্মদ রফিক

তোমার মুখের'পর নামে ছায়া আতুর সন্ধ্যার
ভেজা ছায়া, খালের কিনার ঘেঁষে পড়ে আছে নাও,
কর্মহীন ছাড়া ছাড়া কোমল শীতের মেঠো পথ,
নিথর জলের ম্লান ঢেউগুলো অলস মন্থর
ভেঙে ভেঙে সন্ধ্যায় অস্পষ্ট ক্রমে স্থবির বিলীন,
হাতের তালুর সাথে অন্ধকার গাঢ় হয় প্রেমে
তীব্র অনুনয়ে ঘেরে চুম্বনের সংরাগে স্মৃতিতে
লেপ্টে যায় সমস্ত শরীরে ভয় সংক্রমিত ভয়
ছম-ছম তোমার মুখের 'পর ক্রমে নামে ছায়া
কিছু আলো-অন্ধকার কিছু চেনা কিছু বা অচেনা ;
খালের কিনার ঘেঁষে একা নাও পড়ে থাকে একা।

তোমার দুইটি হাতে পৃথিবীর মৌলিক কবিতা

মহাদেব সাহা

তোমার দু'হাত মেলে দেখিনি কখনো
এখানে যে ফুটে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলাপ,
তোমার দু'হাত মেলে দেখিনি কখনো
এখানে যে লেখা আছে হৃদয়ের গাঢ় পঙক্তিগুলি।
ফুল ভালোবাসি ব'লে অহঙ্কার করেছি বৃথাই
শিল্প ভালোবাসি ব'লে অনর্থক বড়াই করেছি,
মূর্খ আমি বুঝি নাই তোমার দু'খানি হাত
কতো বেশি মানবিক ফুল—
বুঝি নাই কতো বেশি অনুভূতিময়
এই দু'টি হাতের আঙুল।
তোমার দু'খানি হাত খুলে আমি কেন যে দেখিনি,
কেন যে করিনি পাঠ এই শুদ্ধ প্রেমের কবিতা!
গোলাপ দেখেছি ব'লে এতোকাল আমি ভুল করেছি কেবল
তোমার দুইটি হাত মেলে ধ'রে লজ্জায় এবার ঢাকি মুখ।
তোমার দুইটি হাতে
ফুটে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গোলাপ,
তোমার দুইটি হাতে
পৃথিবীর একমাত্র মৌলিক কবিতা।

তুমি চ'লে যাচ্ছো

নির্মলেন্দু গুণ

তুমি চ'লে যাচ্ছো, নদীতে কল্লোল তুলে লঞ্চ ছাড়ছে,
কালো ধোঁয়ার ধস্ ধস্ আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে
তোমার ক্লান্ত অপসৃয়মাণ মুখশ্রী—সেই কবে থেকে
তোমার চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছি।
তুমি চ'লে যাচ্ছো, তোমার চ'লে যাওয়া কিছুতেই শেষ হচ্ছে না,
সেই কবে থেকে তুমি যাচ্ছো, তবু শেষ হচ্ছে না, শেষ হচ্ছে না।
বাতাসের সঙ্গে কথা ব'লে, বৃষ্টির সঙ্গে কথা ব'লে
ধলেশ্বরীর দিকে চোখ ফেরাতেই তোমাকে আবার দেখলুম।
আবার নতুন ক'রে তোমার চ'লে যাওয়ার শুরু। তুমি যাচ্ছো,
নদীতে কল্লোল তুলে লঞ্চ ছাড়ছে, কালো ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার ক্লান্ত অপসৃয়মাণ মুখশ্রী যেন আবার সেই প্রথমবারের মতো
চলে যাওয়া—তুমি চ'লে যাচ্ছো, আমি দুই চোখে তোমার
চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছি, তাকিয়ে রয়েছি।

তুমি চ'লে যাচ্ছো নদীতে কান্নার কল্লোল,
তুমি চ'লে যাচ্ছো বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ,
তুমি চ'লে যাচ্ছো চৈতন্যে অস্থির দোলা, লঞ্চ ছাড়ছে
টারবাইনে বিদ্যুৎগতি ঝড় তুলেছে প্রাণের বৈঠায়।
কালো ধোঁয়ার দূরত্ব চিরে চিরে ভেসে উঠছে
তোমার অপসৃয়মান মুখশ্রী, তুমি ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠছো।
তোমার চ'লে যাওয়া কিছুতেই শেষ হচ্ছে না।
তিন হাজার দিন ধ'রে তুমি যাচ্ছো, যাচ্ছো আর যাচ্ছো।

২

তুমি চ'লে যাচ্ছো, আকাশ ভেঙে পড়ছে তরঙ্গিত নদীর জ্যোৎস্নায়
কালো রাজহংসের মতো তোমার নৌকো
কাশবনের বুক চিরে চিরে আঁখ ক্ষেতের পাশ দিয়ে
যাচ্ছে অজানা ভুবনের ডাকে। তুমি চ'লে যাচ্ছো,
আকাশ ভেঙে পড়ছে আকাশের মতো। হে তরঙ্গ, হে সর্বগ্রাসী
নদী, হে নিষ্ঠুর কালো নৌকো, তোমরা মাথায় তুলে
যাকে নিয়ে যাচ্ছো সে আমার কিছুই ছিল না—তবু কেন
সন্ধ্যার আকাশ এ রকম ভেঙে পড়লো নদীর জ্যোৎস্নায় ?
ভেঙে পড়লো জলের অতলে—তুমি চ'লে যাচ্ছো ব'লে ?

৩

তুমি চ'লে যাচ্ছো, ল্যাম্পপোস্ট থেকে খ'সে পড়ছে বাল্ব,
সমস্ত শহর জুড়ে নেমে আসছে মাটির নিচের গাঢ় তমাল
তমসা। যেন কোনো বিজ্ঞ যাদুকর কালো স্কার্ফ দিয়ে এ শহর
দিয়েছে মুড়িয়ে। দু'একটি বিষণ্ন ঝিঝি ছাড়া আর কোনো গান নেই,
শব্দ নেই, জীবনের শিল্প নেই, নেই কোনো প্রাণের সঞ্চার।
এ শহর অন্ধ ক'রে তুমি চ'লে যাচ্ছো অন্য এক দূরের নগরে।
আমি সেই নগরীর কাল্পনিক কিছু আলো চোখে মেখে নিয়ে
তোমার গন্তব্যের দিকে, নীলিমায় তাকিয়ে রয়েছি। তুমি চ'লে যাচ্ছো,
তোমার বিদায়ী চোখে, চশমায় নূহের প্লাবন। তুমি চ'লে যাচ্ছো,
বিউগলে বিষণ্ন সুর ঝড় তুলছে অন্তর্গত অশোক কাননে।
তুমি চ'লে যাচ্ছো,
তোমার পশ্চাতে এক রিক্ত নিঃস্ব মৃতের নগরী প'ড়ে আছে।

৪

অনন্ত অস্থির চোখে বেদনার মেঘ জমে আছে,
তোমার মুখের দিকে তাকতে পারি না।
তোমাকে দেখার নামে চতুর্দিকে পরিপার্শ্ব দেখি।
বিমান বন্দরে বৃষ্টি, দু'চোখ জলের কাছে ছুটে যেতে চায়
তোমার চোখের দিকে তাকাতে পারি না।

৫

তুমি চ'লে যাচ্ছো, আমার কবিতাগুলো শরবিদ্ধ
আহত সিংহের ক্ষোভ বুকে নিয়ে প'ড়ে আছে একা।
তুমি চ'লে যাচ্ছো, কতগুলো শব্দের চোখে জল।

জেফিরাসের শোক

আবু কায়সার

তোমার ফ্লাটে গিয়েছিলাম তুমি ডাক দিয়েছিলে বলেই
মফঃস্বলের অনূঢ়া পাড়ায়, গহন গঞ্জে, হানাবাড়িময় গ্রামে
নির্মীয়মাণ শিশুপার্কে, মার্কারির কৃত্রিম জোছনায়, ছায়াশরীরে
বেঘোরে অকারণে রোদ্দুরে হাওয়ায় অমাবস্যায় কতোকাল
কতোকাল ধরেই যে হাঁটছি—

মনে পড়ে এক অসতর্ক সন্ধ্যায় অবিরাম হাঁটতে হাঁটতে
পদ্মফুলের লোভে নেমে পড়েছিলাম বিলে
যদিও সাঁতার জানিনা
তারপর বুকের পশমে শ্যাওলার স্বস্তিকা এঁকে
এক অনামা নদীর খাড়ি ধরে চলতে চলতে পৌছে গিয়েছিলাম
রূপনারাণের ঘাটে
যেখানে আফিম ফুলের ঝাঁঝ ডানায় মাখে ভ্রমব
যেখানে জীবনানন্দের অবিশ্রান্ত পংক্তির মতো সারি সারি ভীড় জমে
পানকৌড়িদের—

আমি রেল ইঞ্জিনের শান্টিংয়ের শব্দে স্বপ্নচ্যুত হয়ে কতোরাত
কতোরাত উঠে বসেছি শয্যায়
বুকের অর্গল ঠেলে কান্না এলে মধ্যরাতে আমি
চমকে দিয়েছি আয়না
আমি ঘোর বর্ষণেও চেনাঘরে যাইনি—তুমি
ডাকলে বলেই গেলাম।

বোনেরা এলোচুলে সরষে ক্ষেতের ধারে বসে গান গাইতো
হাট-ফেরত বাবা বনকলমীর বিল থেকে শাপলা তুলে আনলে
আমার মা সেই জলজ লতার গয়না পরতো গলায়—

দেয়ালের ধাবন্ত টিকটিকির ল্যাজ যেমন অবলীলায় ছিটকে পড়ে
ভেজা কার্পেটের চিত্রিত ময়ূরের নখরাগ্রে—
যেরকম কথা দিয়েও কথা রাখেনা বাঘিনীর মতো মেয়েমানুষ

আমার ব্যক্তিগত গ্রাম অনেকটা সেই দীঘল রেলওয়ে জংশন।
তবু ভিখিরিকে আমি সন্ত বলিনি—জল্লাদের লোলচর্ম গলায়
কখনো পরিয়ে দিইনি শুকনো বকুলফুলের মালা
ইচ্ছা ছিলো—তবুও আর শেষটায়
যাওয়া হয়নি ঐতিহ্যের রাজাবাজারে—

দাহ্য দেয়ালের অন্তর্গত তোমার কুঞ্জবনের কথা শৈশবে
পুরাণে পড়েছিলাম
যৌবনে মুঠোয় পেয়েও ড্রেনে ছুঁড়েছি পরশমণি
দেখেও দেখিনি জোনাকীদের ঘরবাসর।—
তুমি ডাকলে বলেই গেলাম।

আমি কবে কখন সেই পদচিহ্নহীন উপকূলে পৌঁছে গেলাম জানিনা
শুধু জানি-তুমি আমাকে আলিঙ্গন করলে প্রেম ঘৃণা ও অভিসম্পাত দিলে
তারপর কটিদেশের গুপ্তঅস্ত্র বের করে আমূল প্রোথিত করলে
আমার চোখে—

দৃষ্টির গলিত হীরে টাটকা মাখনের মতো জ্বলে উঠলো তোমার
ছুরির ফলায়—
যেন তুমি প্রাতরাশের টেবিল সাজাচ্ছো।

একটি মৃত্যু

মাহমুদ আল জামান

আমার দুঃখের জন্ম আছে, আমার আনন্দের মৃত্যু আছে।
রাহেলা,
শবাধার কাঁধে নিয়ে যাবো
ছোঁব না তোমার শরীর।
আমার চোখ আছে, আমি অন্ধ, আমি পোড়া।
শুদ্ধ সঙ্গীতে ভরে গিয়েছে তোমার জল, তোমার হাওয়া
গাছের পাতায় অন্ধ মানুষের জন্য
মেশে না তোমার ভেতর অধীর।
এখানে লাফিয়ে মরছে
মাছ, আজ্ঞাবাহী দাস।
এখানে
হারিয়ে যাচ্ছে ঘরের চাবি
হারিয়ে যাচ্ছে ঝড় বাদল আর সূর্যমুখী।
যে মোছাতে পারে সে অস্ত্রের গৌরবে পড়ে আছে।
যে যুদ্ধাহত জাগাতে পারে সে জঞ্জালে পথহারা।
রাহেলা,
এই মন্থর মধ্যাহ্নে স্তব্ধতা আর বিস্ময়ে
তোমার মৃত্যু
আমার বৃষ্টির মধ্যে চলে যাচ্ছে
রাহেলা
বৃক্ষের ছায়ার কি কোন সংখ্যাতত্ত্ব আছে?
রাহেলা,
নদীর কি কোন প্রাকৃতিক উৎসমুখ থাকে?
রাহেলা
একটি গাছের ভেতর অন্য একটি গাছ
একটি গাছের ভেতর অন্য একটি দৃশ্যে
আমার শব্দের সঙ্গী এখন ভীষণ একা
রাহেলা
দুটি মানুষ এখন একটি মানুষের মধ্যে
খুন হয়ে ছুটে চলছে হেমন্তের মাঠে।

তুমি হে মহিলা প্রতিদিন

ফারুক আলমগীর

মধ্যরাতে অপঠিত পুস্তকের পাতার মতোন
রহস্যময় তোমার অবাণীবদ্ধ অবয়ব, যেন কোন
ছলাকলা জেনেছ কী জান না এমন
বোধগম্যহীন, শ্যামল শরীর ব্যাপী সুনিবিড়
ছড়িয়ে সুনীল ছায়া হেঁটে যাও দীর্ঘতরু
ধীর লয়ে, কোথায় গন্তব্য ওগো
বলো, কোথায় যাচ্ছো হে সুকুমারী
দুপুরের কড়া রোদে ভিজে একাকার
নিজের গভীরে তুমি চলেছো কোথায়
কোন্ দেশে কোন্ সে সুদূর !

সিঁড়িতে শব্দিত পদপাতে পাতি কান
বেলা কী বারোটা সব ঘড়িতে এখন
সড়কে কী পাবো দেখা
নীল শাড়ী নীল ছাতা
এমনকি পাদুকাও নীল
আকাশের সাথে বুঝি
খেলা হবে বৌ-চি
বাতাসে ভাসাও তাই নীল ডানা
নীলোৎপলা, চোখের গভীরে ঢেকে
রেখেছো কী নীল জল
চাতক পাখির জন্যে, নাকি দোয়েল
বাংলার শীষ দেয়া পাখি পাবে ছায়া
লেজ-ঝোলা ফিঙে
রেল লাইন বরাবর ঝুলে থাকো
টেলিফোন তারে, কখনো কী ধরেছো
কমলা রঙের টেলিফোনে হৃদয়ের দূরাভাষ !

আমি তো সরিয়ে রাখি কম্পমান হাতে
টেলিফোন দূরে

সিঁড়িতে যখন বাজো তুমি দ্রুত লয়ে
ঠক্ ঠক্ সুরে
ঘড়িতে সময় কত ? বিকেল চারটা কী এখন ?
তোমার ফেরার পালা, আমার প্রস্তুতি দ্রুত
—কর্মোদ্দেশে গমন

বাইরে সবুজ পত্রালীতে হাওয়া দিচ্ছে
ইস্কুল ছুটির বেলা
ফিরছেন তিনি দিনশেষে দীর্ঘতর দিনমনি
যেন, কবেকার হতাশার চটুলার মিলা !

পৃথিবীতে প্রথম

সৈয়দ আবুল মকসুদ

আরণ্য জীবনে যে প্রথম সংসারী হতে চেয়েছিলো,
রাশি রাশি কাঠ কেটে নড়বড়ে ঘর বেঁধেছিলো,
সে-ই পৃথিবীর প্রথম প্রেমিক ;

সুখের সংসার ছেড়ে পৃথিবীর প্রথম বিবাগী
এবং পৃথিবীর প্রথম পাগল
একজন অপরাজেয় প্রেমিক ;

জগতে প্রথম গানের প্রথম কলির
রচয়িতা সুরকার ও গায়ক যে-জন
তিনিও জনৈক প্রেমিক ;

পৃথিবীতে যে-মানুষ প্রথম আত্মহত্যা করে,
নারী কি পুরুষ সঠিক জানি না আমি আজ,
তবে জানি যে তার বুকে ভালোবাসা ছিলো,

প্রথম পৃথিবীতে কোনো মানব মানবীর
কান্নার অভিজ্ঞতা ছিলো না,
হাসতেও জানতো না কেউ,
একদা হঠাৎ যে-লোকটি কেঁদে উঠলো হু হু,
সে এক ভীষণ প্রেমিক ;
প্রথম হো হো করে হেসে উঠেছিলো যে-জন
সেও এক দূরন্ত প্রেমিক ;

এইভাবে দেখা যায় এ বিশ্বের সবকিছুতেই
প্রথম স্থান অধিকারী প্রেমিক।

পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে

হুমায়ুন কবীর

কী আর এমন ক্ষতি যদি আমি চোখে চোখ রাখি
পদাবলী পড়ে থাক সাতাশে জুলাই বহুদূর
এখন দুপুর দ্যাখো দোতলায় পড়ে আছে একা
চলো না সেখানে যাই। করিডোরে আজ খুব হাওয়া
বুড়ো বটে দু'টো দশে উড়ে এলো ক'টা পাতিকাক।
স্নান কি করোনি আজ ? চুল তাই মৃদু এলোমেলো ?
খেয়েছ তো ? ক্লাস ছিলো সকাল ন'টায়
কিছুই লাগে না ভালো ; পাজামা প্রচুর ধুলো ভরা
জামাটায় ভাঁজ নেই পাঁচদিন আজ
তুমি কি একটু এসে মৃদু হেসে তাকাবে সহজে
বলোনি তো কাল রাতে চাঁদ ছিল দোতলার টবে
নিরিবিলি কটা ফুলে তুমি ছিলে একা

সেদিন সকালে আমি, গায়ে ছিলো ভাঁজভাঙা জামা
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথে,হাতে ছিলো নতুন কবিতা
হেঁটে গেলে দ্রুত পায়ে তাকালে না তুমি
কাজ ছিলো নাকি খুব ? —বুঝি তাই হবে।

ওদিকে তাকাও দ্যাখো কলরব নেই করিডোরে
সেমিনার ফাঁকা হলো হেড স্যার হেঁটে গেল ওই।
না-না-যেও না তুমি, চোখে আর তাকাবো না আমি
বসে থাকি শুধু এই—এইটুকু দূরে বই নিয়ে
এ টেবিলে আমি আর ও টেবিলে তুমি নতমুখী।

পিছু টান

সানাউল হক খান

যৌবন বলছে—যাই যাই
জীবন বলছে—থাকো ;
আকাশ নত হয়ে দ্যাখে দুটো ঝাপসা চোখ।

পথের ওপর পড়ন্ত রোদ
মিছিল বলছে—থাকো,
অচেনা সব পথিক আমার হাত ছাড়তে নারাজ।

মেঘ গাইছে বিদায়-গুরু
বৃষ্টি দিলো সখ্য
নারীও তার ভেজা আঁচল উড়িয়ে রাখে আজ....

মাটি কাঁদলো আর্তনাদে
মা কাঁদলো—খোকা।
আমি তাদের শব্দে হলাম একা-একাই বোকা।

আমি বলছি—যাবো যাবো
ঘর বলছে—না ;
অবাধ্য সেই দুয়ার আমার আটকে রাখে পা।

সময়বন্দী

সাযযাদ কাদির

স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে থেমে আছি।
তোমাকে দেখছি, তুমি এসেছো।
তবু তোমার এগিয়ে আসার দিকে যেতে পারছি না
হাত তুলে সাড়া দিতে পারছি না।
স্টেশনে তুলকালাম ভিড়, ছেড়ে যাচ্ছে সময়ের ট্রেন,
হুলস্থুল কোলাহল।
তোমাকে দেখছি, খুঁজে খুঁজে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে তোমার চোখ।
তবু আমাকে হয়তো পাওয়া যাবে না।

দোষ দিচ্ছি নিজেকেই।
অথচ ট্রেনের টাইমটেবল নিয়ে আমার কিছুই করার ছিলো না।
হ'তে পারে অনেক বেশি লেট করেছে তোমার ট্রেন
হ'তে পারে সব ক'টি ট্রেন ফেল ক'রে
অবশেষে তুমি এই ভুল ট্রেনে এসেছো
হ'তে পারে আমিই ফেলের ভয়ে
অনেক আগের এক ভুল ট্রেনে
এখানে পৌঁছেছি!
দোষ দেবো এই ভুল দু'টি ট্রেনকে?

ভিড়ের দু'পাশে এই দু'জন বিভক্ত এখন।
এ-পাশে স্থির দাঁড়িয়ে আমি
ভিড়ের বিষয়টি নিয়ে ভাবছি।
ও-পাশে আমাকে খুঁজছো তুমি
হয়তো ভাবছো সময় কি, অসময় কি।
ওদিকে ছেড়ে যাচ্ছে সময়ের ট্রেন,
আমরা একত্রে কখনো আর ও-ট্রেনের যাত্রী হবো না।
তোমাকে দেখছি, তুমি এখন ভাবছো।
এই ভিড়ের স্টেশনটিই ভুল,
এখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

আমাকে ভালোবাসার পর

হুমায়ুন আজাদ

আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের মতো থাকবে না তোমার,
যেমন হিরোশিমার পর আর কিছুই আগের মতো নেই
উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত।

যে-কলিংবেল বাজে নি তাকেই মুহুর্মুহু শুনবে বজ্রের মতো বেজে উঠতে
এবং থরথর ক'রে উঠবে দরোজাজানালা আর তোমার হৃদপিন্ড।
পরমুহূর্তেই তোমার ঝনঝন-করে ওঠা এলোমেলো রক্ত
ঠান্ডা হ'য়ে যাবে যেমন একাত্তরে দরোজায় বুটের অদ্ভুত শব্দে
নিথর স্তব্ধ হ'য়ে যেতো ঢাকা শহরের জনগণ।

আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের মতো থাকবে না তোমার।
রাস্তায় নেমেই দেখবে বিপরীত দিক থেকে আসা প্রতিটি রিকশয়
ছুটে আসছি আমি আর তোমাকে পেরিয়ে চ'লে যাচ্ছি
এদিকে-সেদিকে। তখন তোমার রক্তে আর কালো চশমায় এতো অন্ধকার
যেনো তুমি ওই চোখে কোনোদিন কিছুই দ্যাখো নি।

আমাকে ভালোবাসার পর তুমি ভুলে যাবে বাস্তব আর অবাস্তব,
বস্তু আর স্বপ্নের পার্থক্য। সিঁড়ি ভেবে পা রাখবে স্বপ্নের চূড়োতে,
ঘাস ভেবে দু-পা ছড়িয়ে বসবে অবাস্তবে,
লাল টকটকে ফুল ভেবে খোঁপায় গুঁজবে গুচ্ছ গুচ্ছ স্বপ্ন।

না-খোলা শাওয়ারের নিচে বারোই ডিসেম্বর থেকে তুমি অনন্তকাল দাঁড়িয়ে
থাকবে এই ভেবে যে তোমার চুলে ত্বকে ওষ্ঠে গ্রীবায় অজস্র ধারায়
ঝরছে বোদলেয়ারের আশ্চর্য মেঘদল।

তোমার যে-ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলো উদ্যমপরায়ণ এক প্রাক্তন প্রেমিক,
আমাকে ভালোবাসার পর সেই নষ্ট ঠোঁট খসে প'ড়ে
সেখানে ফুটবে এক অনিন্দ্য গোলাপ।

আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের মতো থাকবে না তোমার।
নিজেকে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মনে হবে যেনো তুমি শতাব্দীর পর শতাব্দী
শুয়ে আছো হাসপাতালে। পরমুহূর্তেই মনে হবে যেনো
মানুষের ইতিহাসে একমাত্র তুমিই সুস্থ, অন্যরা ভীষণ অসুস্থ।

শহর আর সভ্যতার ময়লা স্রোত ভেঙে তুমি যখন চৌরাস্তায় এসে
ধরবে আমার হাত, তখন তোমার মনে হবে এ-শহর আর বিংশ শতাব্দীর
জীবন ও সভ্যতার নোংরা পানিতে একটি নীলিমা-ছোঁয়া মৃণালের শীর্ষে
তুমি ফুটে আছো এক নিষ্পাপ বিশুদ্ধ পদ্ম—
পবিত্র অজর।

মীরা বাঈ

আবুল হাসান

ভজন গায় না, তবু কথা তার ত্রিকালের তাপিত ভজন,
যখোন জীবন কাঁটা রাখে তার পথে পথে
সে তখোন পায়ের তলায় বিদ্ধ ব্যথা নিয়ে নতুন নিয়মে পুষ্পিত।

ভুল বোঝে লোকে, ভাবে গরবিনী অথবা অস্থির অভিমানী ঃ
কিন্তু আমি জানি তাঁর হাতের উপর কেন উড়ে আসে
আহত পাখির দল—মানুষ, মলিন চাষা, চীৎকৃত প্রসূন।

ভিতরে বিশাল এক মমতাক্ষমতা, জানে যুঁইফুল মাটির তলায়
কিসের আবেগে বাড়ে—কতটুকু সান্ত্বনায় শিকড়প্রবাহে জাগে
পৃথিবীতে আজো সব ভালোবাসা, স্নেহ, প্রেম, শুভতা, শুভ্রতা।

নিজেই আহত ; তবু লোকে ভাবে রয়েছে লুকোনো তার মুঠোর ভিতর
কালকেউটের ঝাঁপি, লোহার করাত, ছুরি, ঘাতকের বিষ!

সে তার সুন্দরে পোড়ে আর ওরা ভাবে দেখো জ্বালালো আগুন!

সে চায় সংসার, যাতে সুন্দরের বিন্দু বিন্দু বোধের চরকায়
সুতো কেটে দিন যাবে ঃ কিন্তু ওরা তার পাহারায়
অদৃশ্যে এখনো আজো তুলে রাখে বজ্রপাত, লোকনিন্দা, লোলুপ ধিক্কার।

কেউ বোঝে না, তবু আছে আরো আকাঙ্ক্ষিত সুস্নিগ্ধ জগৎ :
যখোন মানুষ তাকে দুঃখ দেয়,
দলবেঁধে যখোন ঠোকরায় তাঁকে নষ্ট কিছু পাখি,
তখোন ঘাসের দিকে তাকাও—দেখবে ঘাস নতমুখ, অধোবদনের
কিছু ভাষাস্নেহ লেগে আছে তৃষ্ণার্ত তরুর ঠোঁটে
ভোরবেলা শিশিরের মতো।

আমাদের ভালোবাসা, মেহেরজান

ফরহাদ মজহার

তোমার প্রতি
তোমাকে লক্ষ্য করে এই পংক্তিমালা, মেহেরজান
তোমার জন্যে আমার এই কবিতা

তোমাকে প্রথম যখন আবিষ্কার করি
তখন তুমি ছিলে কিশোরী
মলমলের ওড়নার মধ্যে উদগ্রীব তোমার নার্গিস—
তোমার অংকুরোদ্‌গম
তুমি সবে ঢাকতে শিখেছ তোমার শরমিন্‌ পাপড়ি
তোমার মখমল
আর আমি তোমার সেই টলমল সম্মোহনের সামনে বিহ্বল-
আবিষ্কারের আনন্দে ছুটে গিয়েছি তোমার দিকে
দ্রুত অতিক্রম করে গিয়েছি আমার মাসুম কৈশোর
আমার নাবালক জাগরণ
আমার পা জড়িয়ে ধরেছে কিশোর প্রত্যূষ
আমার পা জড়িয়ে ধরেছে স্বেদার্ত শবনম
আমি ভিজে গিয়েছি শীতকাতর আনন্দে
আমার মৌসুম ভরে গিয়েছে বয়ঃসন্ধিতে
অপ্রাপ্তবয়স্ক আবহাওয়ায়
আমি ছুটে গিয়েছি উল্লম্ফনে
বয়স্ক পদক্ষেপে
কিন্তু তখনো রচিত হয়নি এইসব পংক্তি, মেহেরজান
তখনো আমি কবিতা লিখতে শিখিনি।

অতঃপর তুমি ডাগর হয়েছো
খোঁপার ফুলে ও নাকফুলে প্রস্তাবিত হয়েছো তুমি

দিল ও দেনমোহর পণ করে আগ্রাসী হয়েছে
তোমার যৌবন
ঠোঁট ব্যগ্র হয়েছে তৃষ্ণায়—উৎপূর্ণ আগ্রহে
আমাদের কাবিননামায় দস্তখত ফুটে উঠেছে
শোণিতের ও সমুদ্রের
ফলে আঁচল ও অবগুণ্ঠনের আব্রু উপেক্ষা করে
তুমি ঝরে গিয়েছো বিস্তীর্ণ নিবেদনে
এবং আমি ঝিনুকের মতো তা সন্তর্পণে তোমাকে
সংগ্রহ করেছি
যাবতীয় প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে উচ্চারিত হয়েছি
প্রেমে ও পৌরুষে
আমি তোমাকে ভালবাসতে শিখেছি
তোমাকে চুমু খাবার জন্যে বয়েস বেড়ে গিয়েছে আমার
তোমার শরীর নিয়ে আমি খেলা করেছি শিশুর মতো
তোমার হাত তুলে নিয়েছি আমার হাতে
তুমি আমাকে—তোমার হাতে, তোমার মধ্যে
তারপর সেই যুগল সমর্পণের মধ্যে হেঁটে গিয়েছি দুজনে
সর্বত্র
আমি তোমাকে নিয়ে গিয়েছি উত্তরে ও পশ্চিমে
দক্ষিণে ও পূবে
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের উভয় দিকে হেঁটে গিয়েছি আমরা
নির্জন সব স্রোতস্বিনীর বুকে হৃদয় নিক্ষেপ করে
মোহনায় মোহনায় পরস্পরের মধ্যে স্রোতস্বিনী হয়েছি আবার
মানুষ আর মানুষীর যুগল পদক্ষেপ অনুসরণ করে
এগিয়ে গেছি আমরা
অন্যদের মতো—অন্য সবার মতো
কিন্তু পুরুষ ও রমণীর চিরায়ত আলিঙ্গণ থেকে
উত্থিত নয় এইসব পংক্তি, মেহেরজান
আরো গভীর প্রয়োজনে এই কবিতা।

আমাকে বলা হয়েছে আমার পাঁজর থেকে তোমার জন্ম
আমাকে বলা হয়েছে নিষিদ্ধ গন্দম খেয়ে তুমি পাতকিনী
    এবং তোমার পাপে আমি পাপী

আমার জিন্দেগী জান্নাত থেকে বহিস্কৃত তোমার দোষে
    বেহেশ্‌ত থেকে অধঃপতিত
কিন্তু আমি সাফ সাফ বলেছি মিথ্যে কথা
    মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে এইসব গায়েবী উপাখ্যান, মেহেরজান
উপাখ্যান থেকে উৎপন্ন নই, আমরা
আমাদের জন্মপৃথিবীর পাঁজর থেকে
    এবং আমাদের ভেতর দিয়ে পৃথিবী নিজেকে
        উপস্থাপিত করে চলেছে
আমি গড়ে তুলছি পৃথিবী—
            তোমার ভেতর দিয়ে
তুমি গড়ে তুলছ পৃথিবী
            আমার ভেতর দিয়ে
কিন্তু তবু এই পারস্পরিক পুনরুৎপাদন থেকে
    উৎপন্ন নয় এই পদ্য, মেহেরজান
আরো গভীর দরকারে, এই কবিতা
লক্ষ্য কর এ কবিতার মধ্যে নারী নেই, পুরুষ নেই
    আমার যে নারী সে পুরুষ
    এবং যে পুরুষ সে একই সংগে নারী
লক্ষ্য কর এ কবিতা পুরুষের মতো ভালবাসে
    এবং নারীর মতো ভালবাসা গ্রহণ করে
এবং একই সংগে এ কবিতা নারীর মতো ভালবাসে
        এবং পুরুষের মতো ভালবাসা গ্রহণ করে
আমার ভালবাসা একই সংগে নারী
            এবং একই সংগে পুরুষ
লক্ষ্য কর, মেহেরজান
    এ কবিতা অন্যসব কবিতার মত নয়।

তোমার প্রতি
তোমার লিপস্টিককাতর ঠোঁট, খোঁপার ফুল
ও নাকফুলের প্রতি নয়
তোমার প্রতি
তোমার স্তন উরু ও অপরাপর
রমণীমূলক চিহ্নের প্রতি নয়
তোমার প্রতি
তোমার মাংসল লাস্য ও নাতিশীতোষ্ণ
আহ্বানের প্রতি নয়
তোমার মানুষকে লক্ষ্য করে এই কবিতা, মেহেরজান
মানুষের ভালোবাসা থেকে উৎপন্ন এইসব প্রেমিক অক্ষর !—

নারী ও পুরুষ
পুরুষ ও নারী
বড়ো দীর্ঘ এই বিচ্ছেদ
বড়ো বেশী দীর্ঘ এই বিরহ
অতএব লক্ষ্য কর আমার এই প্রত্যাবর্তন, মেহেরজান
তোমার মধ্যে আমার কিম্বা আমার মধ্যে তোমার
ফিরে আসা
বড়ো দীর্ঘকাল কি আমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করিনি ?
বড়ো দীর্ঘকাল কি মানুষ মানুষের জন্যে অপেক্ষা করেনি ?
লক্ষ্য কর কিভাবে আমরা পরস্পরের বিপরীতের মধ্যে
পরস্পরকে রোপণ করে যাচ্ছি
ভবিষ্যতের জন্যে, মানুষের সর্বকালীন অস্তিত্বের জন্যে
নতুন সময়ের জন্যে।
নারীর প্রতি নয়
পুরুষের প্রতি নয়
ভালোবাসার মধ্যে নারী নেই কিম্বা পুরুষ নেই
তোমার প্রতি
এবং আমার প্রতি
আমাদের প্রতি
আমাদের অদ্বৈত একত্রীভবনের প্রতি
এই পংক্তিমালা, মেহেরজান
যুগপৎ নারী ও পুরুষের বিলুপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে
প্রণীত হল।

একদিন

মাহবুব সাদিক

একদিন অকস্মাৎ দুঃস্বপ্নের তন্তুজাল ভেঙে
নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে জেগে উঠবো সাগরবেলায়—
চন্দনের গন্ধে ভ'রে যাবে চরাচর, নীল জলে
উঠবে তোলপাড়, শূন্য বন্দরে এসে ঝাপ খাবে আনন্দপূর্ণিমা
ভোরের সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান দাঁড়াবো তরুণ ;
ধূসর হাওয়াই শার্ট ছেঁড়াখোড়া জামাজুতো
হাওয়ায় ওড়ানো চুল পরিপাটি থাকবে শুয়ে
আমিষের স্বাদু গন্ধে নিন্দ্ যাবে আলস্যে বিড়াল ;

নৈসঙ্গের নির্জনতা ভেঙে একদিন সমুদ্রপাখির মতো
ডানা মেলে উড়ে যাবো—ভুলে যাবো শতাব্দীর আরক্ত কল্লোল
হাঙরের মতো মানুষের মুখের ব্যাদান
          প্রান্তরের কোলে অতিকায় কামান-বন্দুক
          বেদনা ব্লিজার্ডে ভাঙা তরুণীর মুখ
সভ্যতার মারী ও মড়ক ভুলে যাবো
কখনো ক্লান্ত শব্দে করবো না কথকতা
প্রান্তরের ঘাসে শুয়ে রবো অপার জ্যোৎস্নায় ;

একদিন মহান উত্থান হবে
দূর চক্রবাল থেকে শূন্য বন্দরে এসে ভিড়বে তরণী
রাঙা রোদে মদির নাবিক এসে ফেলবে নোঙর
               একদিন জমবে উৎসব
মানুষেরা জন্তু থেকে পুনর্বার মানবিক হবে.
হতশ্রী বন্দর ছেড়ে পাল তুলে সান্ধ্যভ্রমণে যাবো
নীলজল তোলপাড় ক'রে
          ওঠে আসবে গভীর গোপন চাঁদ

তুমি এলে একদিন
অগুরু চন্দনে ভ'রে যাবে গরীব জীবন।

প্রতিমা

হেলাল হাফিজ

প্রেমের প্রতিমা তুমি, প্রণয়ের তীর্থ আমার।

বেদনার করুণ কৈশোর থেকে তোমাকে সাজাবো বলে
ভেঙেছি নিজেকে কী যে তুমুল উল্লাসে অবিরাম
তুমি তার কিছু কি দেখেছো ?

একদিন এইপথে নির্লোভ ভ্রমণে
মৌলিক নির্মাণ চেয়ে কী ব্যাকুল স্থপতি ছিলাম,
কেন কালিমা না ছুঁয়ে শুধু তোমাকে ছুঁলাম
ওসবের কতোটা জেনেছো ?

শুনেছি সুখেই বেশ আছো। কিছু ভাঙচুর আর
তোলপাড় নিয়ে আজ আমিও সচ্ছল, টলমল
অনেক কষ্টের দামে জীবন গিয়েছে জেনে
মূলতই ভালোবাসা মিলনে মলিন হয়, বিরহে উজ্জ্বল।

এ আমার মোহ বলো, খেলা বলো
অবৈধ মুদ্রার মতো অচল আকাঙ্ক্ষা কিংবা
যা খুশি তা বলো,
সে আমার সোনালি গৌরব
নারী, সে আমার অনুপম প্রেম।
তুমি জানো, পাড়া-প্রতিবেশী জানে পাই নি তোমাকে,
অথচ রয়েছো তুমি এই কবি সন্ন্যাসীর ভোগে আর ত্যাগে।

আমরা যখন

আলতাফ হোসেন

আমরা যখন কেউ কোথাও যাইনি তখন গল্প হতো আমাদের
আমরা তখন কেউ জানতাম না যে আমরা অনেক দূরে দূরে গেছি
মনে হতো এক সঙ্গেই আছি, এক ঘরে, একই পার্কে, একই ন্যুমার্কেটে
আর গল্প হতো
একজন শোনাতাম আর একজনকে
একজন যখন বলতাম আর একজন শুনতাম

আর এখন সমুদ্র থেকে তিনমাস পর
আমি ফিরে এলে
আমাদের ত্রিশ বছরের বিচ্ছেদের পর
আমরা একই সঙ্গে গল্প বলে যাচ্ছি,
আর
আমাদের সমুদ্রের হাহাকারের গল্প
ডাঙ্গার পাড়াপড়শির নৈমিত্তিক সুখদুঃখের কাহিনী
মিলে-মিশে
বাতাসে যাচ্ছে মিলিয়ে

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

শিপুর জন্য কবিতা

কোথাও রোদ উঠলে ভাবি
ভালোবাসার গাছ বেড়ে উঠছে ধীরে,
নিশ্চিত হয়ে যাই
এবার চেতনা পাবো
সহজেই চিনে নেবো নিম ও জারুল .....

কখনো মেঘ ডাকলে বুঝি
বৃষ্টিতে ভিজে যাবে উত্তর-দক্ষিণ
সামনে যেজন আছে
সেও বুঝি
স্নানঘর ফেলে রেখে বাইরে দাঁড়াবে .....

কাউকে বৈশাখে পেলে বলি ঃ
সময়তো বয়ে যায়,
এসোনা এবেলা
আমরাও গান গাই—
　　'আমার দোসর যেজন ওগো তারে
　　কে জানে, কে জানে ....

দূর

জাহিদুল হক

শূন্য শহর, হেঁটে চলি একা
কখনো দাঁড়াই, কার্নিশে দেখা
যাচ্ছে আকাশ মেঘের ডানায়
'আমি খুবই একা' একথা জানায়।

এই দুঃখের গাঢ় গহ্বরে
আসবেনা তুমি প্রগাঢ় শহরে ;
ভরা গিটারের বার্সেলোনায়
কি করো এখন, স্মৃতির কোনায় ?

ইচ্ছে আমার এমনি বেয়াড়া
বুকের পাঁজরে শুধু তোলে সাড়া ঃ
ডায়রীতে লিখি, তুমি নেই ব'লে
এ শহর ঢাকা বিচ্ছেদে দোলে।

আমার স্নায়ুতে মুখর শ্লোগানে
বার্সেলোনার গান শুধু হানে,
পড়ছি লোর্কা, দূর কর্দোভা
জেগে ওঠে বুকে—বেদনার শোভা।

তুমি ক্যাসেটে কি নিয়ে গিয়েছিলে
বাংলার বাঁশি, ইলিশের ঘ্রাণ,
না হ'লে দিবস রজনী কি ক'রে
কাটাচ্ছো তুমি ? স্বপ্নের ঘোরে

ঝরে না কি কিছু যৎকিঞ্চিৎ
বাংলার সোনা ধান্যের গীত ;
জলপাই-বীথি, ধান মাড়ানোর
শব্দের মতো, মৃত্যু দোসর।

কার্নিশে কাক, নিঃস্ব দুপুরে
স্মৃতি ঘাই মারে স্নায়ুর পুকুরে
মারি ও বন্যা খলখল ক'রে
হেসে ওঠে দেশে, এই ভাঙা ঘরে

তুমি আসবে না ? আসলে হঠাৎ
ফের উৎসবে বাড়া হবে ভাত
কর্দোভা-ঢাকা উড়াবে পতাকা
সেই মৈত্রের ঃ ভালোবাসা আঁকা

তোমাকে দেখিনা বলেই ভুবনে
দুটি বিচ্ছেদ জেনেছি জীবনে
একটি মৃত্যু অন্যটি তুমি,
শূন্য শহরে ম্লান মৌসুমী।

যদি তুমি আসো আবার শহরে
সাড়া পড়ে যাবে প্রাণের প্রহরে ;
একাকিত্বের ভাঙবে দরোজা
বিচ্ছেদ শেষে, মিলনে ধরো যা

প্রতিবন্ধক ছিলো এতোদিন
পরাজিত হোক ভরা দুর্দিন।
এবং তোমাকে পাবো ব'লে জয়
বুকে ধরে রাখি আজও সঞ্চয়

হোক না ক্ষুদ্র যতোই তুচ্ছ
এখনো জীবন-ময়ুর পুচ্ছ
মেলে সঙ্গীতে নৃত্যের তাল,
তোমাকে দেখিনা হলো কতোকাল।

তাই সন্তাপে হেঁটে চলি একা
কখনো দাঁড়াই, কার্নিশে দেখা
যাচ্ছে আকাশ মেঘের ডানায়,
'আমি খুবই একা' একথা জানায়।

গায়ত্রী ২

মুহম্মদ নূরুল হুদা

অবেলার আমি অবেলার তুমি এ বেলা
পেয়ে যাই যদি দুইটি দয়িত দর্পণ
নার্সিসাসের মতোন তাহলে যে খেলা
খেলতে খেলতে করছি যা কিছু অর্জন

কিছুটা মূল্য তারো হয়তো-বা রয়েছে
জলের উপরে জোড়া তৃণ নই যেহেতু
দগ্ধ হৃদয় অনেক আগুন সয়েছে,—
পোড়া মৃত্তিকা তাই কি গড়েছে এ সেতু ?

রয়েছে অতীত ক্রন্দনগীত অশ্রু
নিজেকে বাতিল করবো না তবু কিছুতে
বুনবো ও-বুকে শস্যের মতো শ্মশ্রু
নামবো দুজনে সমতল থেকে নীচুতে।

কি লাভ কি ক্ষতি আগ্রহী নই অঙ্কে
তোমার জন্যে রয়েছি যখন তৈরি
স্বর্গ চাই না, নামবো নরকে-পঙ্কে
থাকুক জগৎ তোমার আমার বৈরী।

আমরা দুজন পরস্পরের বায়না
মর এ-জীবনে সংসারহীন সঙ্গী
আমরা দুজন দুজনের দুই আয়না
আলোতে-আঁধারে সমঅংশী ও অঙ্গী।

অঙ্গে অঙ্গে জ্বলুক তাহলে দুঃখ
আমরা দুজন পৃথিবীর মতো রুক্ষ।

গমন থেকে গামিনী, হংসগামিনী

ময়ূখ চৌধুরী

এতোদিনে 'হংসগামিনী' কথাটির মানে বুঝলাম।

লৌকিক কথাবার্তায়, গল্পে-উপন্যাসে-কবিতায়
শব্দটা প্রায়ই এসেছে ; এবং যথারীতি
অভিধানের কবরেও শুয়েছিলো তার মরা অর্থটা।
কিন্তু
অর্থ-অনর্থ মিলিয়ে 'হংসগামিনী'র যে-মানে,
তা আমি পাইনি।

এক-একটা করে বেশ কয়েকটা হাঁস, কয়েক প্রকারের হাঁস—মানে হংস
আমার ছিলো ;
অভিধানও ছিলো,
অর্থও ছিলো
সেই সঙ্গে ছিলো অদ্ভুত এক না-থাকা। অর্থাৎ
হাতের তলায় হংস ছিলো, হংসগামিনী ছিলোনা ;
বিশেষ্যের জড়তা ছিলো, বিশেষণের স্পন্দন ছিলোনা।

এ রকম পাথুরে পর্ব থেকে আজ অর্থসভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছে—
ক্রমশ লোহা-তামা-সোনা পেরিয়ে এক-একটা হাঁস হাঁটতে শুরু করেছে;
মানে তারা গমন শুরু করেছে,
তারা মানে হংস নয়, হংসগামিনী!

অর্থের সোনালি ডিম পাড়তে-পাড়তে তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো।
এইভাবে হংস হারিয়ে
এতোদিন পরে আমি 'হংসগামিনী' কথাটার মানে বুঝলাম।

প্রথম প্রেম

শামীম আজাদ

জামালপুরে, জনতা পাঠাগারের পেছনে
ঘাটের কাছের বাড়িতে
তোমার সঙ্গে প্রথম দ্যাখা।
আকাশ-ভরা গন্ধ, আর,
নবীন, তোমার গান
আমার প্রথম প্রেম—
বয়স কম ছিলো বলেই কিনা জানি না,
এমন সন্তরণশীল ছিলে—
পঙক্তি হবার আগেই
সরে যাচ্ছিলে বারবার।
ওভাবেই সেদিন, সারারাত—সারাদিন
সেই ধূম্রজালে তোমার ঠিকানা খুঁজেছি।

একসময় গভীর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছি—
হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে
চোখ বন্ধ রেখেও বুঝি,
বাইরে লাল জ্যোৎস্না
জলের শব্দে বাতাস, এ ঘরে।
উৎস খুঁজতে উঠে দেখি, তুমি
আমার একেবারে বুকের কাছেই॥

বাঁকা চাঁদ বোলো তাকে

শিহাব সরকার

ঈদের ছুটিতে ডাকপিওনেরা চলে গেছে বাড়ি
কাকে দিয়ে পাঠাবো আজ আমার নাড়ী
নক্ষত্রের সমস্ত খবর, যা ছিলো সোচ্চার আনন্দ বিপাকে ?
বাঁকা চাঁদ, তোমাকেই মানি দূত, বোলো তাকে
আমি আপাততঃ ভালো আছি, যদিও
নিঝুম মধ্যরাতে হঠাৎ হঠাৎ নদীও
কবির এক ফোঁটা অশ্রু আর এক ফোঁটা রক্তের ক্ষরণে
নিমেষে হয়ে যায় লাল তুমুল প্লাবন প্রলয়ের ধরনে।

ঠিক তখনি সব মনে পড়ে যায়, আর হারানো দিনগুলি
থেকে ধূলি আর হীরের কণা নিংড়ে এনে নতুন রং তুলি
যা আঁকে, আমার স্বপ্নে, জাগরণে আবহমান আঁকা সে।
বাঁকা চাঁদ, যাও, ওঠো তুমি ঐ জানালার কোনাকুনি পাণ্ডুর আকাশে

স্মৃতির ভিতরে তুমি

মুজিবল হক কবীর

স্মৃতির ভিতরে তুমি ব'সে থাকো নক্ষত্রপ্রতিম
দুপুরের জানালায় ক্লান্ত নতমুখ দেখি
আলুথালু চুল দেখি
চোখের শাসন দেখি
দেখি বয়সের জাগরণ ;
এই দ্বিধা, এরকম ব'সে থাকা তোমাকে মানায়

একদিন জানালা খোলে না আর
জানালার কাচের শরীর তোমার অবাধ্য ছায়া
কেবলি দুলছে।
স্মৃতির ভিতরে তুমি বসে থাকো ভোরের কুসুম
টলমল পায়ে একা একা
কুয়াশা-শিশির মাখা
হৃদয় কুড়াও।
তোমার যৌবন
ভোরের সান্নিধ্য পেয়ে
কমলা কোয়ার মতো
খুলে খুলে যায় ;
স্মৃতির ভিতরে তুমি মাইলস্টোনের মতো
একাকী দাঁড়িয়ে ;
বড়ো অন্ধকার, তোমার মুখের রেখা পাঠ করা
ভীষণ কঠিন
সংসারের কালিঝুলিমাখা দু'টো হাত, হৃদয় ও মন
সমর্পণের ইচ্ছায় কাঁপে
অন্ধকার রক্তের মতোন ধীরে ঘন হ'তে থাকে। মনে হয়,
তোমাকে স্পর্শ করার যোগ্য নই আমি।

ভয়

আবিদ আজাদ

ভয় করে ....

খালাম্মা তোমার গন্ধে ঘুম আসেনা যে
এখন ওপাশে ফেরো, অন্যদিকে মুখ করে শোও
তোমার ভিতরে কিযে হাওয়া কিযে জ্যোৎস্না কিযে নোনা বাদাড়ের ঘ্রাণ
ভূতের পায়ের মতো শোঁ শোঁ বড়ো বড়ো পাতা ঝরে
তোমার চোখের মধ্যে লণ্ঠনের শিখা নাচে কেনো ?
তুমি কি মেলার মাঠ ? চিলেকোঠা ? খোসাহীন বাদামের ছড়াছড়ি ?
আমার হাতের মুঠো ভরে দিচ্ছো কেনো
গোলাকার বরফের কোমল আগুন ?
তোমার নাকের কেশরের তাপে আমি পুড়ে যাবো,...পুড়ে যাবো ...
আমি পুড়ে ছাই হয়ে গেলে তুমি কি ফুঁ দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেবে সেই ছাই ?
খালাম্মা, আমার ভারি ভয় করে, আমাকে নামিয়ে রাখো পাশে

মা দেখলে বকবে না ?

তুমি

ইকবাল হাসান

স্টেইনলেস ব্লেডের মতো ধারালো দৃষ্টি নিয়ে বসে আছো তুমি।

শহরময় ঘুরে ঘুরে মধ্যরাতে বাড়ি ফিরে দেখি
তোমার পায়ের কাছে নতজানু ভোরের কাগজ
বলপেন, কবিতার পান্ডুলিপি, রেফারেন্স ফাইল
নীল বেডল্যাম্প আর নিরীহ লং-প্লে
জ্যামিতিক ক্ষেত্রের মতো টুকরো টুকরো
পড়ে আছে নিস্তব্ধ, প্রাণহীন!

হঠাৎ বাতাস এসে ভাঙচুর করেনি এঘরে
ড্রেসিং টেবলের আয়না অক্ষত রয়েছে বহুদিন।
বহুদিন, গ্লাস ভাঙার কোন শব্দ ওঠেনি
বাতাসে জাগেনি কোন মৃদু কম্পন
শোকেসের তুলতুলে পুতুলগুলি সাজানো রয়েছে, বহুদিন
কাটলারি সেট, রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তি, কাঁচের বাসনকোসন আর
শেলফে প্রিয় কবিদের কাব্যগ্রন্থ রয়েছে অক্ষত।
বহুদিন, কোন ঝড় ওঠেনি সংসারে, তবে
মাঝে মাঝে অকস্মাৎ মেঘের গর্জন আর সেই সঙ্গে
ছিটেফোঁটা বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করেছি!

শহরময় ঘুরে ঘুরে মধ্যরাতে বাড়ি ফিরে দেখি
সমস্ত ধ্বংসের মাঝে স্টেইনলেস ব্লেডের মতো ধারালো
দৃষ্টি নিয়ে বসে আছো তুমি। সত্তরের নভেম্বরের মতো প্রকৃতি
ছিন্নভিন্ন করেছে সংসার—চারদিকে ভাঙা কাঁচ
ওল্টানো চেয়ার টেবল, মানিপ্ল্যান্ট
পিয়ানোর ব্যথিত কোমল রিডগুলো ছড়িয়ে রয়েছে।
মধ্যরাতে বাড়ি ফিরে দেখি, তোমার দু'চোখে যেনো জ্বলছে
আগুন। ঘরময় ছড়ানো একুয়ারিয়ামের নীল জলে
মৃত দু'টি মাছের মতোন বাঁধানো সেই যুগল ছবি

পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে মৃত প্রায়, বিচ্ছিন্ন পড়ে আছে।

হায় আশালতা

নাসির আহমেদ

এতদিন মনে হলো, হায়
আপনাকেই বলা যেতো আমার একান্ত কথাগুলো
চর্যার ভাষার চেয়ে প্রাচীন এবং
দুর্বোধ্য যে কথা এই সংসারের কেউ
কোনোদিন বুঝলো না সে ভাষার মানে
এবং যথার্থ তার অনুবাদ হতে পারতো আপনার হাতেই।
বুকের এ্যালবাম খুলে আপনাকেই দেখাতে পারতাম
কিছু গোপন আলোকচিত্র ঃ
        রিক্ততার নানা রঙা কিছু জলছবি
এবং আপনিই যার প্রকৃত ব্যাখ্যাতা
বড় দেরি হয়ে গেলো হায় আশালতা।

হৃদয়ের প্রশ্ন শুধু 'এতদিন কোথায় ছিলেন' ?
নিঃশব্দে নিজেকে খুব ধিক্কারে ধিক্কারে আজ দগ্ধ করে ফেলি।
যে নিবিড় মমতার হরিৎ শ্যামল ছায়া আপনার দু'চোখে
কৈশোরে তো স্বপ্নে সেই লাবণ্য দেখেই
একটি কিশোর বুনো পাখি হয়ে গেলো
ঝড়-বৃষ্টি রোদ্রে উড়ে ঘুরে ঘুরে এত ক্লান্তি হলো
মুছিয়ে দেয়নি তবু ডানার ক্লান্তির কালি কেউ।
হতাশার অন্ধকারে নির্বাসিত যখন স্বপ্নেরা
যখন কাঁটার ঝোপে আটকা পড়েছে দুটি ডানা
তখন এলেন কেন স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত—আশালতা ?

জানি
আপনার বুকেও খুব অনুতাপ এ মুহূর্তে ঢেউ তুলে যায়
আপনিও নিঃস্ব আর রিক্ত সন্ন্যাসিনী
আপনাকে আবৃত্তি করে এমন সুযোগ্য ভাষাবিদ
এখনো আসেনি কেউ নিঃসঙ্গ জীবনে।
দু'চোখ দেখেই সেই ব্যর্থতার ভাষা আমিও পড়েছি।
নিঃসঙ্গ লতার মতো কোনো বৃক্ষ খুঁজে
পথের ধুলোয় গেছে আপনারওতো আঠারো বছর।

মুখোমুখি আজ সব প্রাপ্তির ওপর শুধু যৌথ দীর্ঘশ্বাস
বড় দেরি হয়ে গেলো হায় আশালতা।

ভ্যান গগ—তোমাকে

ত্রিদিব দস্তিদার

তোমার হুকুমে আছি
হিম্মতকেও রেখেছি তাজা নাশপাতির রঙে
বাধ্য বালক এবার মন-মল্লিকা ফোটাবে তোমার পদ্ম-করতল।
এই পৃথিবীর ফুসফুসেরই মতো
রুটিতে লাগাবে রক্তাভ জেলি, হৃদয়-ক্ষরণের মতো
প্রেমাস্বাদু মাখন।

তোমার অনুগত সময়ের ত্রিকোণ টেবিলে
এখনো আসেনি ভোরের স্বাস্থ্যপায়ী নাস্তা, পছন্দমাফিক
কোনো শুদ্ধ প্রেমিকের একজোড়া চোখ
শাদা পিরিচের বুকে যেন ব্যথিত ডিমপোচ
তোমার অহংকারের মতো সাজানো কাঁটা-চামচ
রূপোর টাকার স্লাইসে গাঁথবে তার সরল শস্য-মুদ্রা
কোনো পছন্দ মানবের কাটা মুন্ডের থালা থেকে উঠে আসবে
কেমন মগজঘন প্রকৃতির দুগ্ধজাত খিরসার আভা
মাংসের পাত্রে কেমন ঘনিষ্ঠ শরীরের স্বাদ ? ঠিকঠাক
আছে কিনা তার কোঁকড়ানো চুলের সালাদ। এবং পরিপূর্ণ
তোমার অভিনীত প্রেমের স্বেচ্ছাচারিতার প্রাত্যহিক প্রাতরাশ,
যথার্থ কিন্তু একান্ত কিনা ?

এবার মনোযোগী উপভোগ শেষে ভালোবাসার পাঁচটি আঙুল
ডোবাবে উত্তপ্ত রক্তের ফিংগার বোলে
তোমার আনুগত নবীন বালক এসে
পুনরায় তুলে দেবে হাত থেকে খসে যাওয়া মমতার মতো
সোনালি টাওয়েল।
তবুও একটি কর্তিত কানের শোভন অস্তিত্বের উপহার
আসবে তোমার প্রযত্নে কোনো এক ভ্যানগগের ঠিকানা হয়ে।

শঙ্খচিল

মাহমুদ শফিক

জোছনা নরোম হালকা মেঘের মতো
ক্যাসেটে এখন বাজছে মৌন রাত,
ডেকে ওঠা কোন দোয়েলের গানে গানে
বাড়িয়েছ তুমি হাতের দিকেই হাত।

বনের গভীরে নিজের ব্যথায় তুমি
ফুটেছ একাকী বনের গোলাপ যেন
আমিও বুঝেছি, শক্ত কলির ভোর
দু'ঠোটে তোমার নীরবে কেঁদেছে কেন।

বিদিশার মতো আমার বসতবাড়ি
কেঁদেছে কত যে ঝড়ো বাতাসের রাতে,
পথের রেখায় মিলেছে পায়ের পাতা
যেন বা মোহনা মিলেছে নদীর সাথে।

স্মৃতি ঝলমল আমার মুখের ছায়া
হৃদয়ে তোমার হয়ে আছি মরুভূমি।
আয়নার পিছে আমিতো পারদ নই
ঘষে ঘষে তাকে ফেলবে তুলেই তুমি।

তাইতো এখনো তোমার কথার হ্রদে
ফুটে আছে এক মোহন পদ্ম নীল,
তোমার দু'চোখ নদীর স্বপ্নে শুধু
নীরবে হয়েছে একাকী শঙ্খচিল

জ্যোৎস্নারাতে, জ্যোৎস্নার ভিতরে

দাউদ হায়দার

জ্যোৎস্নারাতে, জ্যোৎস্নার ভিতরে তুমি শুয়ে আছো—
লাবণ্য ঝরিয়ে অপরূপ ; এরকম চন্দ্রের ক্রন্দন দেখেছে বাংলাদেশ।
মানুষের ভিতরে এক চাঁদরাণি আছেন, অতিব্যক্তিগত
নাচায় তারে আমৃত্যু-শোনিতে-জোয়ারে ; সুস্থচিত্রকল্প, রোমাঞ্চ।

তোমার ভিতরে এক তৃষ্ণা ছিলেন, অন্ধকারের মতো কুটিল
জটিল নদীর মতো বহুব্রীহি, সার্থক ; সেখানে দীক্ষা নেয়
জলের প্রাণীরা ; গভীরতা কতদূর জানে না মাছরাঙ্গা—
শ্মশানে পুড়ছে কাঠ, কেউ পোড়ে অস্থিমাংসসহ।

আমার ভিতরে এক বেদনা আছেন, নারীদের মতো স্বভাবচরিত্র—
একবার লজ্জাহীনা হ'লে কুরে খায় কবিতা, সূর্যোদয়—
তুমি জানো, স্বর্ণমুদ্রা খোলেনা সিন্দুক, উদ্ধত পাখি সে, উড়ে যায়।
—কুন্তলে গ্রীবায় কী পরেছ, জ্যোৎস্নার কোমলতা বুঝি ?

—শুয়ে আছো, জ্যোৎস্নারাতে, জ্যোৎস্নার ভিতরে
শ্মশানে পুড়ছে কাঠ, কেউ পোড়ে অস্থিমাংসসহ।

চোখের মধ্যে ছিলো বেদনার বৃষ্টি

ইকবাল আজিজ

আমার চোখের মধ্যে ছিলো বেদনার বৃষ্টি
তুমি দ্যাখোনি অঞ্জনা!
তুমি শুধুই দেখলে সতেরো বছর আগে দেখা
কালো সানগ্লাস পরা এক ফ্যাকাসে ফাঙ্গাস লেগে আছে
ফুলার রোডের রুক্ষ পথে
সে মানুষ নয় সে কিশোর নয়
হয়তো কখনো স্বপ্ন ছিলো।
অথবা শুধুই এক ভীষণ নির্বোধ আবেগপ্রবণ
জন্তু ছিলো!

বৃটিশ কাউন্সিলের লৌহদরোজা দিয়েছে মুছে আজ
অনেক প্রাচীন স্মৃতি।
ষাট দশকের শেষদিকে কালো চুলের বেণী দুলিয়ে
হেঁটে আসা অঞ্জনা তোমায় কখনোই ভুলবো না।
ডিলান টমাসের বইটা পড়তে চেয়েছিলাম
আজো মনে আছে।
তুমি শুধু তাকিয়ে একটি কথা বলেছিলে
সম্ভব নয় বরঙ একদিন বিকেলে চা খেতে আসুন বাসায়, তখনই পড়বেন
তখন ডিলান কী দুষ্প্রাপ্য এ ঢাকায়!
সেই কিশোরবেলায় যথারীতি চাকরের মতো
গিয়েছি ছ নম্বর রোডে, দেখেছি সেখানে লৌহগেট।

অনেক বছর পর আজ দেখা হলো ন্যুমার্কেটে।
আমায় চিনেছো কি অঞ্জনা ?
সতেরো বছর পর ডিলান টমাস কি এখন পড়তে দেবে আমায় ?
শুনেছি তোমার এক কিশোরী কন্যা আছে
হলিক্রসে যায় –
সে কি ডিলান টমাস পড়ে ?
আর অন্য কোনো কিশোর ফার্মগেটের পাশে
একা একা দাঁড়িয়ে কি বই ধার নেয়ার ছলে
সজল বেদনা চায় ?
অনেক বছর পর আজ দেখা হলো ন্যুমার্কেটে।
আমার চোখের মধ্যে ছিলো বেদনার বৃষ্টি,
তুমি দ্যাখোনি অঞ্জনা।
তুমি শুধুই দেখলে সতেরো বছর আগে দেখা
কালো সানগ্লাস পরা এক ফ্যাকাসে ফাঙ্গাস লেগে আছে
ফুলার রোডের বৃক্ষ পথে—
সে মানুষ নয়, সে কিশোর নয়
হয়তো কখনো স্বপ্ন ছিলো
অথবা শুধুই এক ভীষণ নির্বোধ আবেগপ্রবণ
জন্তু ছিলো !

অনির্ণেয় অন্য কোনো মানে

হাসান হাফিজ

ক্ষতস্থানে
পড়েছে প্রলেপ
উবে গ্যাছে জ্বর
বেশ, তারপর ?
সে তো জানে
ভালোবাসা মানে শুধু
শরীরচর্চাই নয়, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নয়
সামাজিক প্রতিপত্তি হাঁকডাক
নয় শুধু, তারও অতিরিক্ত কিছু ....
এই নারী ছলনা শেখেনি
নশ্বর রূপের পসরা নিয়ে শস্তা বিকিকিনি
প্রতারণা, লেপ্টালেপটি
কিভাবে করতে হয় জানা নেই তার
এখানেই
আমার প্রকৃত হার।
আমি তার কাছে বারবার
পরাভূত হতে ভালোবাসি
ক্ষতস্থানে সবুজ মমতা
সঞ্জীবনী জল পেয়ে
বড়ো হয়ে উঠি চারাগাছ

আমিও জেনেছি
ভালোবাসা মানে নয়
শরীরের জড়াজড়ি একমাত্র।
অতিরিক্ত অন্য কিছু
কি কি ঠিক নির্ধারণ করাটা মুশকিল।
রবীন্দ্রনাথের সেই সুরদাস
এই সত্য জেনে ফেলে
নিজেই নিজের চোখ অন্ধ করেছিল।

জন্মান্ধের সৌন্দর্য বর্ণনা

জাহিদ হায়দার

আজ সন্ধ্যায় যখন
    বারান্দায় পাশাপাশি বসেছিলো ওরা,
নারকেল গাছের মাথায় কেবল উঠেছে চাঁদ ;
আর তখনই দক্ষিণের হাওয়া—
রূপার চুলে নদীর ঢেউ তুলে
        চুলগুলো ফেলে দিলো
        রবির জন্মান্ধ চোখের উপর।

আঙুল মাথায় জড়াতে জড়াতে চুল
শুধায় যুবক ঃ
'দিয়েছ চুলেতে বুঝি সুগন্ধি তেল।'
হাসি একা একা হেসে গেলো সে-নারীর ঠোঁটের উপর
'কী সুন্দর চাঁদ উঠলো এখন।'
কথা শুনে কেঁপে ওঠে জন্মান্ধের চোখ ঃ
'চাঁদ দেখতে কেমন ?'
'তোমার হাত দুটো দাও আমার মুখের উপর।'

যুবকের ঠোঁটে আসে প্রশ্নের জোয়ার :
'শুনেছি, তোমার পানপাতা মুখ
টিয়াপাখি নাক,
চাঁদ দেখতে গোল
তুমি কি সুন্দর চাঁদের মতন ?
বাতাস তখন কাটছে চাঁদ নারকেল পাতার তলোয়ারে,
হেসে ওঠে রূপার আকাশ :
'চাঁদ কি নিজেই জানে
        কখন সে পানপাতা ?
        কখন আকাশের বেড়ায় গোঁজা কাস্তে একখানা ?
        কখন মেঘের গামছায় ভাত বাঁধা মালসা মাটির ?'

'লোকে বলে তুমি দেখতে কালো
চাঁদ আর জোসনা কি কালো ?'
হাসির গৌরব মিশে গেছে মায়াবী সন্ধ্যায়,
'কোন জিনিশ দেখতে কেমন
সে গুমর নির্ভর করে
কথা তুমি কার মুখে শোনো,
চাঁদ কারো কাছে কালো
জোসনা কারো কাছে গলে যাওয়া রূপার মতন।'

জন্মান্ধ যুবক আবার বাড়ালো হাত
ভেঙে গেলো বসার গঠন,
'শোনো, কখনো যে দেখি নাই গলে যাওয়া রূপা।'
তৃষ্ণার সমস্ত জল পান করে
জেগে উঠলো নারীর কণ্ঠস্বর ;
'আমাকে যখন তুমি দুই হাতে বাঁধো
হাতের বন্ধনে গলে যায় জোসনা আর চাঁদ,
জন্ম থেকে অন্ধ তুমি
কখনো যে দেখ নাই ফুলের গড়ন
কখনো যে দেখ নাই
হরিণের নীল চোখ ময়ূর পালকে।'

যেন অকস্মাৎ
যুবক কেঁপে ওঠে শীতের হাওয়ায়,
সরে আসে হাত ;
অনাশ্রিত আঙুল কামড়ে ধরে শূন্য করতল।
শোনা যায় সকরুণ অন্ধ কথামালা ঃ
'আমি দেখি
বহমান কালো এক নদী
কালো আকাশের নিচে,
কালো রৌদ্রে উড়ে যায় শত শত কাক ;
না-দেখার পৃথিবীতে কেবল উড়াই কল্পিত আকার।

এতকাল
তুমি যা কিছু তুলে দিয়েছ এই হাতে
বলেছ—এর নাম গন্ধরাজ ফুল
এর নাম ময়ূর পালক,
পায়ের তলার মাটি নেই
তার নাম অন্ধকার ;
যখন বাড়াই হাত শূন্যতায়
হাতের আকাঙ্ক্ষা তোমাকে যদি পায়
আনন্দপ্রতিমা নাচে হাতের ভেতর,
তোমার পরম দেয়া
আর বলায় যে জীবন বিশ্বাস
তাকেই কেবল আমি মেনেছি সুন্দর ;
যদি কোনোদিন
হাতে দাও বিষফুল রক্তকরবী
মুখে বলো—দিলাম গোলাপ ;
সে-গোলাপ হাত বাড়িয়ে তোমাকে না-পাবার মতো,
জানি না দেখতে সেই ফুল কেমন সুন্দর ।।

জ্যোৎস্নার ভেতরে বাড়ি ফেরা

মোহন রায়হান

জ্যোৎস্নার ভেতরে বাড়ি ফিরছি ক'দিন
এরকম বহুদিন আমি বাড়ি ফিরিনি।

বাড়ি বলতে সেই যমুনার স্মৃতি
বুকের ভেতরে বেদনার নদী,
আমার মা ; জেগে থাকে সারারাত
জরাজীর্ণ, শীর্ণকায় ছায়া ফেলতে ফেলতে
ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে হিম মৃত্যুর গুহায় ;
খুক্‌খুক্ কাশি আর ঘুমের মধ্যে আমার নাম ধ'রে
ডেকে ওঠে—খোকা এলি নাকি ?

জ্যোৎস্নার ভেতরে বাড়ি ফিরছি ক'দিন
বাড়ি বলতে মেঠোপথ, গাঁয়ের হালট,
শিশির ভিজে থাকা ঘাস, নরম চাষের ভুঁইয়ে
শুয়ে থাকা হলুদ চাঁদ, সারি সারি গাছ, বাঁশ ঝাড়,
ভুতুড়ে ছায়া, বনফুলের গন্ধ।

জ্যোৎস্নার ভেতরে বাড়ি ফিরছি ক'দিন
আঁকাবাঁকা নদীটির ভাঙাচোরা কূল বেয়ে,
শৈশব কৈশোর যৌবনের স্রোতে
কতদূর ভেসে এসেছি আজ এখানে,
কত প্রেম বিরহের স্মৃতি নিয়ে
আজো হেঁটে যাই এই পথে ;

কতখানি বেদনায় এই মাঠ, এই নদী, আকাশের
অগনন তারা কালের প্রবাহে জেগে আছো ?
তবু কি শুনতে পাও কোন পথিকের ভাঙা পাঁজরের
চাপাকান্না ?
জ্যোৎস্নার ভেতরে বাড়ি ফিরছি ক'দিন
চরাচর মাঠ ফসলের আদিগন্ত জমি,
ভেসে যায়, ভেসে যায় চাঁদের বন্যায়
হুহু করে ওঠে মন ;
এরকম জ্যোৎস্নায় কোনদিন তোমাকে নিয়ে
পথহাঁটা হলোনা আমার।

জীবন যাপন ২

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি ?

আমাদের ভালোলাগাগুলো বিতর্কিত হয়ে উঠছে।
আমাদের চোখ ক্রমশ উদাসীন হয়ে উঠছে।
আমাদের স্পর্শগুলো অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছে।

আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি ?

আমাদের কথোপকথনে
ক্রমশ নেমে আসছে সৌজন্যের কুয়াশা।
আমাদের আলিঙ্গনের ভিতর
খচ্ খচ্ কোরে বিঁধছে এক সন্দেহের কাচ।
আমাদের চুম্বন
ক্রমশ শুধু লালাসিক্ত ওষ্ঠের ব্যর্থতা হয়ে উঠছে।
ক্রমশ শীতল হয়ে পড়ছে আমাদের উদ্দাম ইচ্ছেগুলো।

আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি।

সূর্যাস্তের বিকেলে
পাশাপাশি দুজনের মাঝখানে শুয়ে থাকছে একটি সাপ।
দুজনের উচ্ছল হোন্ডার পেছনে ধাওয়া কোরে আসছে
একটি নীল নেকড়ে।
একটি হাত কেবলই দুদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে দুজনের মুখ।
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা ক্রমশ অনুতপ্ত হয়ে পড়ছি।

আমরা কি অবিশ্বাস করছি আমাদের ?
আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি ?

আমরা পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি কেন ??

ঈর্ষা

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

কয়েকটি স্খলিত চুল লুটেপুটে খুঁটে খায় তোমার অধর
চাঁদের সৌন্দর্য নিয়ে সিঁথি বরাবর একটি ফিরোজা টিপ
উপমার মতো ফুটে থাকে
নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম, দু'হাতে মেহেদী, দু'চোখে কাজল,
কব্জিতে হাতঘড়ি জড়িয়ে ধরেছে কি সুন্দর শরীরে শাড়ী ও অন্তবাস
আমার দারুন হিংসে হয়
আমার দারুন হিংসে হয়
ঠোঁটের একটি কালো তিল
একটু পর-পরই আরেকটি ঠোঁটের আদর খায়
সোনার লকেট যেনো স্পর্শাতীত যুগল চাঁদের কাছাকাছি
ভেজা বেড়ালের মতো শুয়ে থাকে
খোলা চুলে এলোমেলো খেলা করে দুষ্টু বাতাস
আমার ভীষণ হিংসে হয়
আমার ভীষণ হিংসে হয়
টেলিফোন প্রায়ই তোমাকে ডেকে নেয় কতো কাছে
কলিঙবেলটি দেখো যখন তখন ডেকে নেয় দরজায়
টিভি সহজেই কি ভাবে দখল করে রাখে তোমার সময়
কেড়ে খায়

কবিতার বই মুগ্ধতায় ধরে রাখে তোমার দু'চোখ
চায়ের পেয়ালা সকাল বিকাল প্রায়ই তোমাকে চুমু খায়
আমার খুবই হিংসে হয়
আমার খুবই সিংসে হয়

তুমি তো তেমন নদী

তুষার দাশ

আমি জানি কোন্‌খানে ঘা দিলে তোমাকে
হৃদয় রক্তাক্ত হবে,
উড়িয়ে তোমার ওই চঞ্চল অঞ্চল
স্থির লক্ষ্য চোখে গেঁথে যাবে তুমি জীবনের পথে।

হৃদয়ে ক্ষরণ হলে মানুষ বদলে যায় জানি
পৃথিবীর প্রবল প্রতিমা ক্রমে শীর্ণ হয়
দীর্ণ ক'রে অন্ধকার কেউ হয় আলো-অভিসারী
আর কেউ ছায়াচ্ছন্ন মতিচ্ছন্ন অন্ধকার পৃথিবীকে ডাকে।

আমি জানি তুমি তো তেমন নদী এক
ইচ্ছে হলে দু-কূল ভাসাবে
অথবা বাজাবে তুমি বহুদীর্ণ মন্দিরায়
ভুলে যাওয়া কংকালের গান।

একটি নতুন প্রেম

নাসিমা সুলতানা

যতবার সাহসী মানুষ হয়ে উঠে দাঁড়াই
একটি নতুন প্রেম আমাকে ঠেলে দেয় জ্যোৎস্নাপীড়িত মাঠে
দিগন্তের ওপার থেকে দেখা গোধূলীর দিকে,
হাজার হাজার বছর পিছিয়ে যাই আমি
যতবার শক্তি সঞ্চয় করে দু'পায়ে ভর দিই
পাথরে পাথর, হাড় মজ্জায় মাংসে-উৎপন্ন করে নিই যথেষ্ট বিদ্যুৎ
চেতনায় দুধভাত—ছেলেবেলা
ঠিক ততোবার একটি নতুন প্রেম
আমার সমস্ত দৃঢ়তার ওপর ঢেলে দেয় জল
মুখময় বিষণ্নতার লালা
আমি কিছুতেই আর ভাল থাকতে পারিনা
ঘরভর্তি লোকের মধ্যে প্রচন্ড হা হা হেসে উল্টে দিতে পারিনা টেবিল
আমার সমস্ত ভালবাসা গলে গলে কষ্টের মতো টুপটাপ ঝরে যায়
হাঁটু থেকে খুলে পড়ে পা
হাত ঝুলে যায় কাঁধ থেকে ন্যাতানো কাপড়ের মতো
চোখের কোনায় জ্বলজ্বল করতে থাকা আমার সর্বশেষ অহংকার
অপরিচিতের মতো আমাকে ফেলে যায় একা
বিজন অন্ধকারে কাঁদতে থাকি আমি
আঙুল কামড়াই
বাচ্চাছেলের মতো হাত-পা ছুঁড়ি
প্রত্যেকবার একটি নতুন প্রেম শক্তিহীন করে দেয় আমাকে
কেড়ে নেয় ক্রোধ-বিবমিষা-ভয়-আনন্দ ও শান্তি—
আমি চাই ভয়ংকর রকমের লম্বা হয়ে উঠি আমি
বড় হতে হতে কানগুলো ঝুলে পড়ুক কুকুরের মতো
মাথার চুল খাঁড়া হয়ে যাক বৈদ্যুতিক প্রভায়
তারপর এই পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় করে
বিশ্বময় কাদামাটি
ছুঁড়ে দিই ভগবানের মুখে .....
তেমন কিছুই হয় না
হাজার হাজার বছর পিছিয়ে যাই আমি
অথর্ব অক্ষম ভালবাসা ছটফট করে বুকের ভেতরে

হৃদয় চারণা

আবু হাসান শাহরিয়ার

মন ও হৃদয় এক নয় প্রিয়তমা,
দু'জনার আছে শিল্পিত ব্যবধান।
মন চঞ্চল—তাই শুধু তাড়াহুড়ো
হৃদয়ের আছে ঘনিভূত অভিমান।

যা কিছু মোহন, সুন্দর মনোরম—
সব কিছু নিয়ে ধনী হতে চায় মন,
যতদূরতক দৃষ্টির সীমা রেখা
ততদূর তার কাণ্ডি ক্ষত প্রলোভন।

হৃদয়ের আছে অবিনাশী ত্যাগ, আছে
বিরহের জ্বালা, প্রাপ্তির সংবাদ
শস্যের সুখ পেতে হলে চাই তার
কঠিন মাটিতে আজীবন চাষাবাদ।

অধৈর্য মন, জানে না সে আরাধনা,
জানে না কী আছে ধ্যান ও তপস্যাতে—
ভালো লাগে যাকে তড়িঘড়ি চায় কাছে,
জানে না কী সুখ নীরব কষ্টপাতে।

হৃদয়ের আছে সুদীর্ঘ রাহাপথ,
দুঃখের সাত সমুদ্র তেরো নদী,
পরিশেষে আছে পরিণত নির্মাণ,
যার পাহারায় চির জাগরুক বোধি।

মন পেলে তুমি খুশি হবে প্রিয়তমা?
ক্ষণিক প্রাপ্তি থাকে না—ফঙ্গবেনে।
বরং বিরহ নিয়ে চলে যাও দূরে,
পরম প্রাপ্তি তোমাকেই দেবো এনে।

অমর পূর্ণিমা

সুরাইয়া খানম্

তুমি আমার বিশুদ্ধ জল, তুমি আমার পাপ
তোমায় ফেলে কলসী ভরে রাখবো মনস্তাপ ?

তুমি আমার সোনার খনি, তুমি বিষের ঘড়া ঃ
তোমায় ফেলে দুয়ার খুলে আনবো মৃত্যু জরা ?

তুমি আমার বৈঠা তুমি, তুমি আমার মরণ :
তোমায় ফেলে আনবো তুলে কোন্ যাতনার ধরন ?
অগ্নি আমার দেহের আঁচে হয় পুড়ে ছাই ছাই
বাতাস আমার আকাশ খুঁড়ে হয় শুধু ছিনতাই !

এই আভাতে আমি আঁধার আমি হেমের অমা ঃ
তুমি আমার সমস্ত পাপ, তুমি আমার ক্ষমা !

পশ্চিমবাংলার কবিতা

সম্পাদনা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আহ্বান

অরুণ মিত্র

কখনো কখনো
মাথা তুলি পিপাসার গহ্বর ছাড়িয়ে ;
তোমার অমৃত-চোখ কি দেখে তখন
কি দেখে আমার চোখে ?

হয়ত মহিম্ন স্তোত্র পাঠ কর বিধ্বস্ত কপালে,
প্রথম পাখীর উষা বুঝি জেগে ওঠে বন্য চুলে
কিম্বা কোনো জ্যোতিষ্মান কথার ঝঙ্কার তুমি শোনো দুই ঠোঁটের পেষণে।

তোমার উদ্বেল বাহু তরঙ্গের জোয়ারে ভাসায়
দিগ্বলয় অন্ধ পথ সূর্যাস্ত বাসনা ;
আমি কি অবাধ্য নৌকো
আলেয়ার তীর ঘেঁষে ডুবে যাব উচ্ছ্বাসের কুঁয়ে ?
হয়ত তা জানো তাই বননীল জাদু
ভুলে গিয়ে কাঁপো তুমি
শীতের গাছের মতো কখনো কখনো

এর চেয়ে ভালো তুমি
নেমে এসো পিপাসার গহ্বরে আমার,
তোমার অমৃত চোখ খুঁজে পাক দিশা
অঙ্গের জ্বলন্ত রোদে,
জ্বলুক নিখুঁত মিলে আমাদের সহমর তৃষা।

শ্রীমতী

দিনেশ দাস

তুমি তার দেহ ছোঁও
সে তো ছোঁয় তোমার হৃদয়।
অতল অথৈ
হৃদয়ের হ্রদ তার ছুঁতে পারে কই ?

তুমি তার বুক ছোঁও। সকল সময়
সে তো ছুঁয়ে তোমার হৃদয়।
হঠাৎ আশ্বিনে ঝড় তোমাকেই ঘিরে,
সে-মেয়ে সহজে
দু'জনার ধুলোবালি ছুঁড়ে ফেলে তোমাকেই খোঁজে,
শুধু তার পাখি চোখ ভিজে ওঠে সবুজ শিশিরে।

দু ঠোঁটে লেবুর কোয়া নিটোল সরস,
তুমি নিতে পার তার কতটুকু রস ?
সোনার আপেল দুটি কতটুকু দোল খায়
বুনো আকাঙ্ক্ষায়।

সে তো শুয়ে সমুদ্রের মত এক শুভ্র সমারোহে,
উত্তাল তরঙ্গে তার তুমি যাও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে
ভেসে যাও ফেনায় ফেনায়।

তবু রাতে হঠাৎ কখন,
শ্রীমতীর চোখের আলোয়
আলো হয়ে ওঠে গৃহকোণ ;
আশ্বিনের কালো ঝড় বয়ে গিয়ে বয়
ফুরফুরে সাদা হাওয়া হিমের গুঁড়োর ;
দুধের বাটির মত টলটলে আকাশের চাঁদ ওঠে
আশা, শান্তি অনন্ত আলোর।

নিঃশব্দতার ছন্দ

সমর সেন

স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও ?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে,
হাওয়ায় কাঁপেশুধু একটি তারা।

কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে
আমাকে একলা ফেলে ?
কেন তুমি চেয়ে থাক ভাষাহীন,নিঃশব্দ পাথরের মতো ?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকারে,
বাতাসে গাছের পাতা নড়ে,
আর দেবদারুগাছের পেছনে তারাটি কাঁপে আর কাঁপে ;
আমাকে কেন ছেড়ে যাও
মিলনের মুহূর্ত হতে বিরহের স্তব্ধতায় ?

মাঝে মাঝে চকিতে যেন অনুভব করি
তোমার নিঃশব্দতার ছন্দ:
সহসা বুঝতে পারি—
দিনের পরে কেন রাত আসে
আর তারারা কাঁপে আপন মনে,
কেন অন্ধকারে
মাটির পৃথিবীতে আসে সবুজ প্রাণ ,
চপল, তীব্র, নিঃশব্দ প্রাণ—
বুঝতে পারি কেন
স্তব্ধ অর্ধরাত্রে আমাকে তুমি ছেড়ে যাও
মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায়।

তারার বাসরঘর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তারার বাসরঘরে কারা যেন কথা কয়ে যায়
ফিসফিসে ঝাউবন-স্বর।
ওপারে অনেক দিন রোদের পালিশ-মাখা
বল তুমি কারা আজ আছে তারপর ?
কার স্বর কার দেহ মনে আজ করে
কানাকানি
ভয় হয় তার কথা আজ রাতে কতটুকু
জানি !
মন তো সমুদ্র আর আকাশ মেশানো
সহজেই যায় যে হারানো।

তারার বাসরঘরে কার চুল কেঁপে-কেঁপে
ওঠে
একটু হাসির আভা ফুটবে কি স্বপ্ন-মাখা
ঠোঁটে ?
কী কথা বলতে হবে দুরুদুরু বুক জানে না
যে
আমাকে মিশিয়ে নেবে তারাদের পালিশের
কাজে ?
তোমার হৃদয় সে তো রূপকথা-ভরা
ঝাউবন
একটু বাতাস হয়ে বয়ে যেতে দেবে তুমি
স্মৃতির মতন ?

জেনো সেই ক্ষণকাল চিরকাল হবে
তারার ছায়ায় এবার বাসর উৎসবে ।।

গাছে গাছে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গাছে গাছে আমের বোল
ঝল্‌সানো পাতা।
স্নিগ্ধ স্নাত গোধুলির মত
বিলম্বিত
আমাদের ভালবাসা।

পেছনে তাকাই—
গন্‌গনে আগুন।
কপালে জ্বল্ জ্বল্ করছে
ঘাম
—রাজটিকার মত।

আকাশে দীপ্যমান কে তুমি
নক্ষত্রখচিত স্বপ্ন।
ফুরফুরে হাওয়ায় কার ওড়না ?
অবগুণ্ঠনবতী পৃথিবীর।
প্রিয়তমা, তুমি কোথায় ?
প্রতিধ্বনির তরঙ্গে,
চোখের তারায়।

তাহলে এসো, অন্ধকার উদ্ভিন্ন করি ;
আমাদের চোখের স্থির লক্ষ্যে
পৌঁছে যাক সকাল।।

নির্বাসিতের গান

মণীন্দ্র রায়

আবার দুচোখে এস পরিপূর্ণ স্মৃতির ভূগোলে
সীমায় সীমায় বাঁধা হে আমার শরীরী প্রতিমা !
ঝড়ে-বাঁকা নারিকেল পল্লবে তোমারই খোঁপা খোলে,
পদ্মার দুরন্ত বাঁকে স্বপ্নজয়ী গ্রীবার মহিমা।

তোমার ও-মুখ আজ দ্বিতীয়ার চাঁদের পাণ্ডুর
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত—যেন রং মোছা কবেকার
পূর্বপুরুষের ছবি— বিষিণ্ণ, বিস্মৃত, কতদূর !
পূর্ণিমার ঢেউ তুলে এস স্বচ্ছ দু'চোখে আবার।

তুমি কি জানো না মেয়ে যৌবনের উদ্দাম নিঃশ্বাস
কাঁপায় তোমার বুকে তীরলগ্ন নৌকার গলুই !
আধারের হীরাকষে রুদ্ধ এক জলজ উচ্ছ্বাস
তোমার শরীর ঘিরে কাঁদে, তুমি বোঝো না কিছুই ?

কতো রাতে হাটফেরা দেখেছি মাঠের পথে দূরে
আঁধার গ্রামের কোলে অগ্নিবিন্দু তোমার প্রদীপ
প্রতীক্ষায় স্থির ; কতো রাত্রিশেষে সোনার মুকুরে
দেখেছি কপালে আঁকো নবারুণ হিঙ্গুলের টিপ।

তোমার তুলনা নাই, কোমলে কঠোর প্রিয়তমা !
বাংলার মাটির মতো কিছু পলি কিছুটা খোয়াই ;
কোথাও শিশুর মতো পুতুলের খেলা কর জমা ;
আঘাতে জীবন গড়ে, কোথাও বা তুমি সে নেহাই।

তোমাকে দু'চোখে চাই। এস তুমি, হৃদয়ে কাঙাল
কাটে না স্মৃতির স্বপ্নে। খুলে ফেল ও অবগুণ্ঠন।
ছিঁড়ে যাক ক্লান্ত সুর, ভেঙে যাক সানাইয়ের তাল,
দুহাতে হৃদয় দাও—দাও জলমাটির বন্ধন।।

করুণাময়ী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আদর ক'রে যেই তোমাকে বুকের
কাছে টেনে নিলাম
তুমি বললে ঃ 'এই মুহূর্তে সহজভাবেই
তোমার হ'লাম।
কিন্তু এদিন ফুরিয়ে যাবে, সময় এলে
বুড়িয়ে যাবে।'

জানি, এসব সত্যিকথা ; হয়তো
আজই মধ্যরাতে প্রলয় হবে
তবু তুমি, এই মুহূর্তে আমার তুমি
জন্মভূমির মতোই শুদ্ধ, করুণাময়ী।

তুমি

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আমার প্রত্যহ তুমি সহচরী ঘর
খররৌদ্র কথা স্নেহ কলরব কথা
নিশ্বাস আয়াস তুমি আগলে আছ সমস্ত দরোজা
দরোজা প্রস্থান নেই প্রবেশ নিষেধ
তবু রৌদ্রে উপ্ত ছায়া ছায়ায় তলিয়ে স্তব্ধ
অন্তরঙ্গ অবকাশ
স্তব্ধ ও মেদুর চোখ হঠাৎ হাত ও স্তব্ধ
সমস্ত শব্দের পর
অজস্র শব্দের পর
সমস্ত উপরিতল গলিয়ে তলিয়ে
সত্তার পাতাল মূলে
অন্ধকার গহন শিকড়
অন্ধকারে :
যেন-বা নিহিত ফল্গু
সমুদ্র অদৃশ্য ফল্গু
সমুদ্রের দিকে নদী নদী নদী নদীই সমুদ্র
যেন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ
জরায়ুজটিল ধাঁধা
রক্তের বেতারে তবু জননীর হৃদয়ে হুলাৎ
যেন মৃত্যু
ফিরে ফিরে
অন্ধকার
মৃত্যুর সুড়ঙ্গ ফিরে
সহসা ভূস্তর পলি ঘাসের শিকড়
আবার সবুজ স্রোত শিহরণ শিখা
মাটি ও মানুষ মন
খররৌদ্র কথা স্নেহ কলরব কথা
নিঃশ্বাস আয়াস তুমি খুলে যাচ্ছ একে একে সমস্ত দরোজা।

জার্নাল থেকে

অরুণকুমার সরকার

যতদিন পাইনি তোমাকে
ছিলে দূর আকাশের পাখি।
চাওয়া আর পাওয়ার ঘুরপাকে
নেচেছিল আঁখি।

কেন এলে নিচে তরুশাখে ?
শোনোনি কি খাঁটি কথাটাকে ;
যা থাকে তা মনেতেই থাকে
আর সব ফাঁকি ?

২
বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্যময়
তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়।
কত দিনের কত রাতের ঝাপসা তুলির
রঙে-রেখায় আঁকা আমার একটু সময়।

৩
ব্যর্থ হবই। তাই এই ভালোবাসা
এতো করুণ, এতো মধুর।
ব্যর্থ-বা' কেন ? প্লেটোকে পেয়েছি পাশে।
তুমি পবিত্র পদ্ম, বিয়াত্রিচে।

অনেক ঘুরেছি নীল আকাশের নিচে।
খুঁজেছি তোমাকে বিকেলবেলার ঘাসে।
তুমি সুদূর, ক্লান্ত সুর,
তাই মধুর যাওয়া-আসা।

আমাকে সুন্দর করো   সে যে ভালোবেসেছে আমায় !
পরিশুদ্ধ হোক বায়ু ; আকাশ প্রশান্ততর হোক।
আমার হৃদয় ভ'রে দাও শুভ্র নির্মল আলোক।
আমাকে পবিত্র করো সুরভিত অপরাজিতায়।

চৌষট্টি পাপড়ির পদ্ম

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

কী খিস্তি করছেন আপনারা ? পড়ুন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
কিংবা এক হাজার শতাব্দীতে পিছু হেঁটে চলে যান সোজা ;
ডোমনীকে চক্রে নিয়ে রাজরাজ বসুন মশানে,
গুপ্তধর্ম জানুন, বুঝবেন কার জন্য মানবজীবন।
লক্ষ্মীট্যারা একটি মেয়ে আপনাকে যা দিতে পারে তার চেয়ে দামী
কোহিনূর আবিষ্কৃত হয় নাই বুঝবেন আজও ভূ-ভারতে ;
ওঁরা জ্ঞান এবং গুরু, মহীয়সী, মন্দিরের গায়ে দেখুন, বা
কোলে বসিয়ে পড়ুন : যা মৃত্যু, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি।

প্রতিধ্বনি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমার সমস্ত ডাক সে দ্যায় ফিরিয়ে
আমি তাকে পারি না ফেরাতে।
আমি তবু কাছে যাই, পায়ে পায়ে ফিরি,
যখন সন্ধ্যার আলো আকাশের গায়ে
তারা হয়ে কাঁপে,
আমি ডাকি।

রেলপুল পার হই।
দূরের সিগনালে জ্বলে দূরের পিপাসা।
বেলেঘাটা—ধুলোয় আবৃত পথ—
বিদ্যাধরী নদী—
আমি ডাকি,
অ্যাকে অ্যাকে সব ডাক ফিরে আসে,
সে দ্যায় ফিরায়ে,
নিষ্ঠুরা সে।

আমি তাকে দেখিনি কখনও,
শুধু ঘুমে ছাড়া,
কাচের চুড়ির মতো হাসি তার শুনেছি আড়ালে।
মাটিতে লুকিয়ে রেখে অনাবৃত মুখ
চোখের কাজল মোছে চোখে ;
জানি না সে কাঁদে কি না বনের আড়ালে
দিগন্তের বিশাল প্রাচীরে পিঠ দিয়ে
আকাশের নিচে,
চোখে তার আকাঙ্ক্ষার আলো
কাঁপে কি কাঁপে না—
জানি না।

আমি আর সেই নারী
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি
ঝড়ের ধূসর-ঢালা সন্ধ্যায়
কতদিন,
কুয়াশায় হাত রেখে ডেকে গ্যাছি,
চোখে তাকে দেখিনি কখনও।
আমার পালকের বেশ রং কিছু রং
সর্বক্ষণ জলেই পড়ে আছে।
আর আমি ডুবে আছি
আমার মধ্যে....... আমার মনের মধ্যে,
য্যামন করে ডুবে আছে মাছ জলস্রোতে—
অবশ্য এ সবই যতক্ষণ না মাছ ভেসে উঠছে,
এবং ভেসে উঠলেই
ছোঁ মেরে আমাকে জলে নামাচ্ছে
(দৃশ্যত যদিও আমিই ছোঁ মারছি)
এবং ডোবাচ্ছে।

আসলে আমরা উভয়েই
অথৈ জলে।

একটাই মোমবাতি, তবু
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

একটাই মোমবাতি : তুমি তাকে কেন
দু-দিকে জ্বেলেছ ?
খুব অহঙ্কারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা
যায়।
তুমি এত অহঙ্কারী কেন ?
চোখে চোখে রাখতে গেলে অন্য দিকে
চেয়ে থাকো,
হাতে হাত রাখতে গেলে ঠেলে দাও,
হাতের আমলকী-মালা হঠাৎ টান মেরে তুমি
ফেলে দাও,
অথচ তারপরে এত শান্ত স্বরে কথা বলো,
যেন
কিছুই হয়নি, যেন
যা কিছু যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে।
খুব অহঙ্কারি হলে তবেই এমন কাণ্ড করা
যায়
অথচ এমন কাণ্ড করবার এখনই কোনো
দরকার ছিল না।
অন্য-কিছু না থাক, তোমার
স্মৃতি ছিল ; স্মৃতির ভিতরে
ভুবন-ভাসানো একটা নদী ছিল : তুমি
নদীর ভিতরে ফের ডুবে গিয়ে কয়েকটা
বছর
অনায়াসে কাটাতে পারতে। কিন্তু কাটালে
না ;
এখনই দপ করে তুমি জ্বলে উঠলে প্রচণ্ড
হলুদে।
খুব অহঙ্কারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা
যায়।
তুমি এত অহঙ্কারী কেন ?
একটাই মোমবাতি, তবু অহঙ্কারে তাকে
তুমি
দুদিকে জ্বেলেছ।

নির্বাচিত ফুল

কৃষ্ণ ধর

আত্মসমর্পণ চাইলে দিতে পারি নির্বাচিত ফুল
দিতে পারি কিছু কিছু প্রাকৃত প্রহর
স্মৃতিতে উজ্জ্বল

হৃদয়ে পড়েছে চড়া, ধূ ধূ বালি মধ্যাহ্ন বেলায়
নিঃশব্দ নদীর জল, নেই কলস্বর
শুধু স্বপ্নে আছে

ভাবছো কী আর পাবে তার কাছে
তুকতাক, মন্ত্রগুপ্তি, প্রত্নের স্বাক্ষর বর্ণমালা
জানি তুমি ভুলেও ছোঁবে না তা
যদি জ্বলে ওঠে ছোঁয়া লেগে স্মৃতির রুমাল

প্রশ্ন করো, কেন বা এমন হয় ? কেন স্তব্ধ ভোরের আজান ?
সে কি বিশ্বাস বধির, কিংবা শ্রুতির বিভ্রম ?
অথচ তোমার বুকেই আছে বিকল্প সন্ন্যাস
স্মৃতির ভেজানো দরজা আলতো হাতে খুলতে যদি পারো
তাহলে দেখাতে পারি করতলে ধরা আছে
নির্বাচিত ফুল

ইচ্ছা হলে তুলে নিতে পারো

ভালবাসা সব কিছু পারে ।।

একটি প্রত্ন

সিদ্ধেশ্বর সেন

একবার ফেরবার অবকাশ হবে, অতুলনা,
শতাব্দীতে একবার

আমার চোখের থেকে ব্যবহারজীবিত পৃথিবী
নড়ে যাবে

তাহলে তোমাকে দেব
টেথিসের জল

পূর্বজীবীয় কিংবা মেসোজোইক
পললের পর

লুপ্তসাগর থেকে

তোমার জীবাশ্ম বুকে ধ'রে, তারা সব
ক্যান্টাব্রিয়া, জাগ্রোস, কার্পেথীয়
কারাকোরমের
হিমবর্ম্মে হিম হ'য়ে
প্রমথ হয়েছে

তাদের জটার পরে, মৌসুমের
কষাকষি-মেঘ

তাদের শরীরে গিরি—
সংকটের ক্ষত

তাদের মাথার 'পরে লক্ষ বর্গ
মাইলের ওজন, আবহ-
মণ্ডলের ঘনচাপ

তবু তারা স্থির
অবিকল

বক্র-ভূগর্ভে রেখে
পা
উত্থিত শিলার পুরুষকার

তাদের ফেরাবার মতো সাধ্য নেই
আজও আমার

একবার ফেরবার অবকাশ হ'লে অতুলনা,
এসো ফিরে

টেথিসের জল
ছিটাব না, সে সব তোমার গায়ে
সইবে না আর

লুপ্ত-সাগর পাড়ে, ডাকব না
তোমায় আবার

যেসব শতাব্দীর শেষ, একবার কখন
হয়ে গেছে, হ'য়ে গেলে

তার স্মৃতি—
খননের চেয়ে, তুমি
বাঁচবে আবার

এখনো অনেক হিম উত্তপ্ত রয়েছে

নগরীতে অনেক
সন্ত আর শয়তান আড়াআড়ি চায়

তোমার হাতের পরে, তাদের রোমশ
গাঢ় হাত

কৃমির আহার হ'তে, এখনো দণ্ডদণ্ড
বাকি আছে

নগরী অনেক বড় রাত

শতাব্দীতে একবার তোমার চোখের
মেরুজ্যোতি জ্বলে

তারপর অন্ধকার
তারপর, নগরীর পথ বেয়ে
ডবল-ডেকার

জানালায় কাচের আধারে, তোমার
মুখের ডৌল
মাধুর্যযুগের হৃত জীবাশ্মের মতো, সংরক্ষিত
দ্রষ্টব্যের গুণে, এসে পড়ে

ব্যবহারজীবিত এক বিন্দু
পৃথিবী

আমার চোখের থেকে, ন'ড়ে
সার্কুলারে, পড়ে যায়

পুনর্বার, খুঁজে-পেতে
খাড়া করি, তাকে ॥

বসন্তে বসন্তে
রাজলক্ষ্মী দেবী

যদি প্রেম এতোই সহজ হ'তো, তাহ'লে যৌবন
তরংগে তরংগে রাখে প্রাণপ্রাচুর্যের পলিমাটি।
কিন্তু প্রেম গুছি গুছি ধান নয়, সার্থক রোপণ
করা যাবে,—চোখ বুজে যেদিকেই ছ'সাত পা হাঁটি।
অবশ্য প্রেমের নামে মধু-তিক্ত-কষায় স্বাদের
নানা ফল কল্পবৃক্ষে ফলে। পেয়ে সহজ সন্ধান
মৌমাছির মতো যারা ঝাঁক বেঁধে আসে—ধ্যানজ্ঞান
ভুলে গিয়ে নৃত্য করে,—নিত্য মেলা, মচ্ছব তাদের।।

ভ্রান্তিস্বর্গে কতিপয় ঋতু নয়। পরিবর্তে কবি
বিশিষ্ট ভাগ্যের সূত্রে পাবে স্থায়ী বসন্ত-বাহার,
যে হেমন্তে পাতাটি ঝরে না, এক মাঘে শীত পার।
পাবে যুগান্তরব্যাপী প্রেম,— দূরাভাস,—চলচ্ছবি।
বসন্তে বসন্তে তাকে ডাক দেবে যোগিয়া ভৈরবী।।

পৌত্তলিক

অরবিন্দ গুহ

ভালোবেসেছিলাম একটি স্বৈরিণীকে
খরচ ক'রে চোদ্দসিকে।
স্বৈরিণীও ভালোবাসা দিতে পারে
হিসেবমতো উষ্ণ নিপুণ অন্ধকারে।
তাকে এখন মনে করি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি।

কী নাম ছিলো ? সঠিক এখন মনে তো নেই ;
আয়ুর শেষে স্মৃতি খানিক খর্ব হবেই।
গোলাপী ? না, তরঙ্গিণী ? কুসুমবালা ?
যাকগে, খোঁপায় বাঁধা ছিলো বকুলমালা,
ছিলো বুঝি দু-চোখ তার কাজলটানা ;
চোদ্দসিকেয় ছুঁয়েছিলাম পরীর ডানা,
এখন আমি ডানার গন্ধে কৌটো ভরি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি।

অন্ধ কিছু দ্যাখে না, তার কণ্ঠ পারে
ফুল ফোটাতে অন্ধকারে।
অন্ধকারে যে-গান বানাই একলা হাতে
সুদূর সরল একতারাতে
সে-গান কোথায় ভাষা পেল, স্বচ্ছ ভাষা ?
মূলে আমার চোদ্দসিকের ভালোবাসা।
জলের তলায় মস্ত একটা আকাশ ধরি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি।

আয়ুধ স্পর্শ ক'রে বলি

শান্তিকুমার ঘোষ

আগামীতে আস্থা নেই, থাকতে চাই উদ্দীপিত
বর্তমানের চূড়ায়-চূড়ায়
পতন নয় প্রেমে আমার ··· ফীনিক্স পাখির অভ্যুত্থান
বস্তুপুঞ্জ ভেঙে-চুরে শক্তি রবে জ্যোতিষ্মান
নয় এ ভুবন অসুন্দর, বিষাদভার সরিয়ে দিয়ে
প্রসন্নতা কে ছড়ায়
আয়ুধ স্পর্শ ক'রে বলি, রূপের মধ্যে খুঁজবো শুভ
প্রতিষ্ঠা নয়, স্থিতিও নয়—ভালোবাসার জগৎ ধ্রুব
দুঃখে জোয়ার ফেনিয়ে ওঠে—বাঁচবো গাছ তারই তীরে
মেলে' নীড়ের শুশ্রুষা
জীবন হ'য়ে উঠবে শিল্প
ফেলে' রঙিন মিথ্যা ভূষা।

গর্জনতেলের ঝিকিমিকি, বিসর্জনের বাজনা
গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তাহাকে লইয়া অনেক পদ্য লিখিয়াছি এবং লিখিতেছি। উপায় কি ?
সে আমার বাঁচা-মরার সর্বস্ব দখল করিয়া বসিয়া আছে দীর্ঘকাল।
মনে পড়িতেছে, সেইবার সপ্তমী পূজার দিন সন্ধ্যায় সে আসিয়াছিল
সাজিয়া গুজিয়া। অমনি তাহাকে লইয়া লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম
একখানি পদ্য। যেন পাকা ধানের মতো রঙ, যেন দুর্গাঠাকরুন
ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিয়া দারুণ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

দুর্গাঠাকরুন কী মানাইল ? দুর্গাঠাকরুনের সহিত সেই পুরাতন
নাটমন্দির, ঢাকের বাদ্য ভিড় করিয়া আসিতেই
  আমি চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম গর্জনতেলের গন্ধে,
দুর্গাঠাকরুন বিসর্জনে যাইতেছেন, দুর্গাঠাকরুন বিসর্জনে যাইতেছেন,
  মনে পড়িয়াছিল।

আসলে প্রেমের পদ্য লিখিতে বসিলেই আমার এই এক অবস্থা।
পুরাণ-প্রতিমার মতো বড় সাহেবের বড় মেয়ের মুখখানি মনে পড়িয়া যায়,
মনে পড়িয়া যায় ছোট সাহেবের ছোট বোনের ঢলঢলে মুখখানির স্মৃতি।
হায় ঈশ্বর, যাহাকে লইয়া ঘর করিব, যাহাকে লইয়া ঘর করিতেছি,
তাহাকে লইয়া লেখা হইয়া উঠিল না এই জীবনে এক অক্ষরও।

অবিরল আমি প্রতিমা বানাইয়া যাইতেছি। আর তাহারই মধ্যস্থলে
গর্জনতেলের ঝিকিমিকি, তাহারই মধ্যস্থলে বিসর্জনের বাজনা
বাজিয়া যায়, বাজিয়া যায়, বাজিয়া যায়।

দাপট

সুনীল বসু

মেয়েটি দারুণ খুব সম্ভব লাক্ষাদ্বীপের
গ্রীবায় দুলছে জবার মালাটি কানে ইস্পাত বালা
আমাকেই কেন লোভে তাতাচ্ছে ছুরি বেঁধাচ্ছে
 এখন আমার বয়স গিয়েছে বেঢপ হয়েছি অবিকল পিপে
কত যে হাজার ঝুট-ঝামেলায় হচ্ছি তো ঝালাপালা।

ছেলে ছোকরারা খেলাবে তো ওকে মূল্য তো দেবে
শরীর এবং আগুন যখন টাটকা রয়েছে, আমি কি পারব ?
 হয়ত হারব, আমি কি পারবো ?
মেয়েটিকে তুলে হাতের তালুতে, লাটিম ঘোরাতে
 তার মানে এই ··· তার মানে এই ···
ঝটকায় ওর কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরব লাফিয়ে উঠব টাট্টু ঘোড়ায়
দফায় দফায় দৌড়ে বেড়াব চক্কর দেব ডিঙোব পাহাড়
বয়স হয়েছে, দাঁড়াব কি উঠে, খাব ডিগবাজী
লোকে বলবে কি আচ্ছা মেজাজ, আচ্ছা তো পাজী
যদি খাই কোনো গোঁয়ার আছাড়, হয়ে যাই খোঁড়া

মেয়েটি দারুণ তপ্ত আগুন, মেয়েটি জানে কি তুকতাক্ গুণ
 নইলে আমার শরীরের লোহা এমন কেন যে তাতাচ্ছে ওর
মদের মতন তাকানোর ঘোর, হয়েই যাচ্ছি সেই সেকালের তাতার বা হুন
যেন চুম্বক হয়েই টানছে আমার দেহের সমস্ত জোর
 আমার অস্থি মাংসের জোড়

তাহলে দেখুক বুকের চাতালে এখনো কেমন
এক ঝট্‌কায় তুলে নিতে পারি অপ্সরী নারী
জলের উপরে ঘুরে চলে যাব, হাওয়ায় নদীতে ভেসে চলে যাব, নৌকো যেমন
যদিও হয়েছি অনুগত এক ঘোর-সংসারী
তোমাকে খেলানো সহজ ছিল তো যেদিন আমার রক্তে ছিল ত
 ডাকাতের মত উলঙ্গ পাপ
কেন ফের আলো মদের মতন বাদামী দেহের খয়েরি পশম
 লুকোনো গোলাপ!

পরিণয়

আলোক সরকার

আগেকার মতো অত দৌড়ে হেঁটো না। এখন তো আর
জামা-পরা বালিকা নও। এখন শাড়িতে
পা আটকে যেতে পারে। তোমাকে দেখবার
জন্যে যে দিঘল স্রোত পাড়ে 'আছড়ে পড়ে তাকে দেখতে দাও। দেখো
চারিদিকে বড়-বড় চোখ সব তোমাকে দেখতে চায়।
তুমি অত দ্রুত গেলে হবে না তো।

আমিও সমস্ত ধেনু প্রথম দিনের মার কাছে
ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি সোনার মুকুট পরে এবার এসেছি।
এসো আমরা দুইজনে পাশাপাশি মগ্ন অবকাশে
আবছা নদীর তীরে কথা বলি।

সেদিন তো নদীর ভাষা বুঝতে পারোনি। কিংবা সেদিন
একবারো নদীর দিকে ফিরেও চাওনি।
অবশ্য নদীর ভাষা সেইদিন এমন প্রেমিক
ছিলো না।   চারিদিকে কী রকম আলো দেখো
আম কুড়োবার গন্ধ একেবারে নয়। বৈশাখী ঝড়ের
মধ্যে যেন ফুলে-ওঠা সংহতির অশথ কি আম জাম গাছ।

দুহাত তুলে বলেছিলাম

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

দুহাত তুলে বলেছিলাম—ফিরিয়ে নাও
আমায় তোমার চাকর করো,
আমার চোখের নোন্‌তা জলে আলতা পরো
চুল ভিজিয়ে বেণী বানাও—
দুহাত তুলে বলেছিলাম, ছুঁয়েই দেখ
সবটা হয়ত পাথর হয়নি,
একটুখানি সেঁক পেলে তো গলতে পারে
বুকের খাঁচা, খাঁচার পাখি, পাখিটার বুক।
তুমি এমন কৃপণ হয়েছ, দিলে না সুখ
স্বস্তিও না—
এবার নষ্ট হলে আমায় দোষ দিও না।

বলেছিলাম, বসে থাকবো,
চিরকাল ধুলো হয়ে পাশেপাশে থাকবো-
যতদিন না চটির থেকে একটু গোবর
দিয়ে আমায় শুদ্ধ করছো।
চিরকাল যে অনন্তকাল··· শুষ্কতা যে বড়ো অসুখ! ···
দেখা হয় না, দেখা হয় না,
কোন্ বিদেশে বুড়ো হচ্ছ
দিয়ে যাও সেই একটা খবর।
তুমি এমন কৃপণ রইলে দিলে না সুখ
স্বস্তিও না—
এবার নষ্ট হবো, আমায় দোষ দিও না।

সে

কবিতা সিংহ

যতদিন সে ছিল ঘরে
ঘরে এবং চরাচরে
অসুখ তাকে ছুঁয়েছিল
সুখ না থাকার অসুখ !

একটু নাছোড় জ্বরের মতো
জ্বরের কিংবা ভরের মতো
নাড়িতে তার লেগে ছিল
ঘোর দুঃখের খানিক।

অমল ছিল দুয়ের মধ্যে
—সক্তি অনাসক্তির
যেমন ফাগুন আগুন বোশেখ
মধ্যে রাখে চত্তির

একই ডালে নতুন পাতা
একই ডালে শুকনো
অমল আমার এই-বা ভালো
এই-বা আবার রুগ্ন

এখন অমল ঘরেই আছে
ঘরে চরাচরেই আছে
অসুখ তাকে আর ছুঁয়ে নেই
আর ছুঁয়ে নেই দুঃখ
হাওয়ার সঙ্গে জলের সঙ্গে
গাছের পাতার অঙ্গে অঙ্গে
গহন এবং সূক্ষ্ম।

ঘর

শঙ্খ ঘোষ

কখনো মনে হয় তুমি ধানখেতে ঢেউ, তারই সুগন্ধে গভীর তোমার
উদাত্ত-অনুদাত্তে বাঁধা দেহ, প্রসারিত, হিল্লোলিত
আমি ডুবে যাই নিবিড়ে নিমগ্ন বৃষ্টিরেণুর মতো,
শিউরে ওঠে সমস্ত পর্ণকণা
জীবনের রোমাঞ্চে, ধূপের ধোঁয়ার মতো মাটির শরীর জাগে কুণ্ডলিত
কুয়াশায়
তারই কেন্দ্রে তুমি, তুমি প্রসারিত, হিল্লোলিত, প্রসারিত।
আজ মনে হয় কী ক্ষমাহীন রাতগুলি বেঁধেছিল আমায়। বাইরে তার
সজল মেঘাবরণ, দেখে ভুললে, কামনার দুই ঠোঁটে টেনে নিলে বুকের
উপর বারে-বারে, ঘুলিয়ে উঠল অন্তরাত্মা
কিন্তু কাছে এসে দেখলে, হায়, এ কী ভগ্নকরুণ অবনত দয়িত আমার!
এই কি সে দিব্যসজল মুখশ্রীর যৌবন যাকে আমি
মগ্ন আকাশের অসংখ্য
তারার মতো চুম্বনকর্ণিকায় ভরে দিতে পারতুম, হায়
ব'লে উদ্‌বেল হলো করুণা তোমার দুই বুকে,
যুগল নিঃশ্বাস প্রবাহিত হলো
ধানখেতের উপর তোমারই সংহত শরীরের মতো, দূরে
আর তার নিপীড়ন দেহ ভরে আস্বাদ করে আস্তে-আস্তে উন্মোচিত হতে
থাকে আমার সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকার!

কথোপকথন

পূর্ণেন্দু পত্রী

তোমার চিঠি আজ বিকেলের চারটে নাগাদ
পেলাম।
দেরি হলেও জবাব দিলে, সপ্তকোটি
সেলাম।
আমার জন্যে কান্নাকাটি ? মনকে পাথর
বানাও।
চারুলতা আসছে আবার। দেখবে কিনা
জানাও।
কখন কোথায় দেখা হচ্ছে লেখোনি এক
ফোঁটাও।
পিঠে পরীর ডানা দিলে, এবার হাওয়ায়
ছোটাও।
আসরে কি সেই রেস্টুরেন্টে, সীতাংশু যার
মালিক ?
রূপোলী ধান খুঁটবে বলে ছটফটাচ্ছে
শালিক।

বিদায়

আনন্দ বাগচী

এখন আর তার সঙ্গে দেখা হয় না, জনারণ্যে বিচ্ছিন্ন কলকাতা
দোয়াত উপুড় করা তুমুল বৃষ্টিতে সব পারাপারহীন পাঁকজলে
ডুবে যায়, ট্রাফিক আইল্যান্ড
জলবন্দী পথের নাটকে জেগে থাকে।
রুমালে দুচোখ বাঁধা মানুষের খুব কাছে যেমন মানুষ
নাগালের মধ্যে এসে সরে যায় আলতো পায়ে,
গায়ে এসে লাগে
ছলকানো নিঃশ্বাস, কিছু ফিসফাস কথার ছলনা। জানি, আছে
সে তবু নিকটে, আছে তেমনি করে, শুধু দেখা হয় না এখন।
উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে তাব ছক বেড়েছে যদিও
ক্রমশ নিশ্ছিদ্র হয় কলকাতার রুদ্ধশ্বাস মুঠো
মাথায মাথায় কালো রাস্তাগুলো পাঁচিল তুলেছে
বিপজ্জনক বাস টাল খেয়ে আবর্জনা ছড়াতে ছড়াতে
অন্য দুর্ঘটনার দিকে চলে যায় চোখের পলকে।
এখন আর তার সঙ্গে দেখা হয় না নষ্ট টেলিফোনে কান চেপে,
শ্লেটের লেখার মত মুছে গেছে প্রিয়জন, বন্ধুজন, নারী—
যে ছিল চোখের জল, আমার ঘড়ির সঙ্গে যার ঘড়ি
মিলতো বাস স্টপে
না-লেখা গল্পের কিছু পৃষ্ঠা কোনো চিলেকোঠা, সিঁড়ির তলায়
খোয়া গেছে, শঙ্খচিল আকাশের নিচে
মাশুল বিহীন চিঠি, লজ্জাহর প্রথম চুম্বন

আমি বড়ো মূর্খ, আমি নিরন্তর বিদায় বুঝিনি।

সমর্পিত হৃদয়, সময়ে

বটকৃষ্ণ দে

১. 'যখন প্রথম ধরেছে কলি
আমার মল্লিকা-বনে
কুড়ির ঘুম ভাঙলো,
সেই থেকে উত্তর চল্লিশে
এসে, আজ রাত্রিদিনে, ঘুমে জাগরণে
সেই তেমনি দক্ষিণের বারান্দায়, হাওয়ায়,
প্রণয় নমিত ভাবনায়,
অন্তলীনা প্রীতিচারণায়
স্মৃতিতে, আকৈশোর তৃষ্ণায়, চাওয়ায়
পাওয়া না পাওয়ায়—
একই গুন্‌গুন্ :
শুধু তুমি, তুমি।

কৃষ্ণচূড়ার উষ্ণতায় লাল
ভোরের শিশিরে বিভোর শিউলি
গোপন গহন বেদনায় উন্মন !
শরতে, শুভ্রতায়
গুঞ্জিত চঞ্চলতায়,
কৃষ্ণ ভ্রমরের তৃষ্ণা কেঁদে মরে,
উষ্ণ, উষ্ণ কৃষ্ণচূড়ায় :
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ রাধা-মন
উদাসী, উন্মন !

সুদেষ্ণা আমার

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
সকলের হৃৎকমলে হাওয়া,
রাঙা কামসূত্র ওড়ে বারান্দায়
শরীরে আনন্দ কারো ধরে না ধরে না
ঘরের জমিন ভেঙে ফেটে পড়ে উদধিমেখলা
আলিঙ্গনের মহোৎসবে।

এরি একপাশে
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজছে সুদেষ্ণা একাকী
পোর্টিকোর নিচে ;
বোধিপর্ণের মতো এ যে বড়ো দারুণ শীর্ণতা
সুদেষ্ণার, তার
দক্ষিণ হাতের অরত্নির দীর্ঘ অনশনসহিষ্ণু দীধিতি,
কোমরের তূণে
ক্ষমার মত স্নিগ্ধ রক্তাভ অক্রোধ কাঞ্চীদাম ;
বাঁ-পায়ের তিনটি আঙুল তূষ্ণী বৈরশূন্যতার অন্যনাম,
কে ওকে স্পর্শ করবে ?
সুদেষ্ণার মাকে দ্যাখো, তিনি
সপ্রতিভ, ততোধিক সপ্রতিভ একটি যুবক
রোচিষ্ণু চিবুক ছুঁয়ে ললন্তিকা গলার হারের
প্রশংসায় গলে গিয়ে অন্য ললনার দিকে হেসে চ'লে যায়,
সুদেষ্ণার মাতা কেন একা-একা সুন্দর হবার
মন্ত্র জানে না ?

সুদেষ্ণার মাতা কেন একাবলী হার ছিঁড়ে ফেলে
হিংসুক নক্তক প'রে অন্য যুবকের অন্যমনস্কতার
সুযোগ নিলেন অবহেলে ?

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
রাশি-রাশি কূর্পাসিক উড়ে পড়ে পঞ্চশরের মন্ত্রণায়-
একপ্রান্তে, একা—
একমাত্র ব্যতিক্রম সুদেষ্ণা আমার
আলীঢ় ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে
অথৈ বৃষ্টিতে ভিজছে, বৃষ্টি এসে কৌতূহলী দাঁত
বসায় ঘাড়ের মাংসে, পীতশিখা সকরুণ তেজে,
প্রতিফলনের বস্তু অবলুপ্ত হয়ে গেছে জেনে,
জেনেও অটুট
আলীঢ় ভঙ্গীতে
এ-ঘরের উৎপীড়িত লজ্জা অপহৃত
সারি-সারি নির্যাতিত নারীদের জঙ্ঘায় জঙ্ঘায়
বুদ্ধমূর্তি জ্বেলে ধরে, বিদ্যুতের মতো আচম্বিতে—

সুদেষ্ণা আমার ।।

চাবি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার কাছে এখনো পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে-যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো ?

থুৎনি পরে তিল তো তোমার আছে
এখন ? ও মন, নতুন দেশে যাবি ?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—
লিখিও, উহা ফিরত চাহো কিনা ?

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরত চাহো কিনা ?

বলা হল না

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বলা হল না তোমায় আমার সেই মোহর কুড়নোর গল্প
পরীক্ষামূলক সেই ধর্মযুদ্ধের কাহিনী
নিজেরই প্রেতাত্মার সামনে, খোলা ছুরি হাতে দাঁড়ানোর সেই
বীরত্বের কথা
রাস্তা বদল করে, তুমি অন্য রাস্তায় গেলে।
আমার চোখের ওপর, সরু হয়ে এল আলো।
বুকের ভেতর, ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত হল
'সাধ ছিল' বলে, আমি বাসের হাতলে ঝুলে পড়লুম।

ভালো লাগে না, আমার ঐ পাতা ওড়ানোর খেলা
ভালো লাগে না, স্বপ্নের ভেতর তোমার মুহুর্মুহু আক্রমণ
আমি কী ফেরারী, যে সর্বক্ষণ কেঁপে উঠব তোমার পায়ের শব্দ পেলে ?

তুমি দোকানে কেনা রুমাল হলে, উড়িয়ে দিতুম হাওয়ায়
সূর্য চাঁদের যাতায়াতের পথে, তুমি সিগনাল দিতে।
তুমি কোষাগার হলে, বার বার আমি নতুন টাকা হয়ে আসতুম
তোমার কাছে,
যাচাই করে নিতে, বাজারে আমার দাম আছে কিনা ?

আমি জন্ম নই, যে প্রতিবাদ তুমি মৃত্যু হয়ে আমায় কাছে টানবে
আমি ইঁট-সুরকীর গাঁথা ভিৎ নই, যে তুমি বুকে দেওয়াল তুলবে।
এমনকি সাধের মখমলও নই, যে ছুঁচ সূতোয় পোষাক বানাবে।

তোমাকে অনেক কথা বলা হল না বলে, আমার কবিতাগুলো তাই
এমন অশুভ
তোমাকে সহাস্য দেখলে আজকাল মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি
মরে যাবো।

দ্বিতীয় বিবাহ

শিবশম্ভু পাল

বাসর রাত্রেই যুবা বিবাহবিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

সে বোঝেনি নবোঢ়ার চোখের কাজলে অসময় ···
অলকাতিলক থেকে জবরদখল সিঁদুরের
রক্তসীমা ভেঙে দিয়ে সুতাশঙ্খ চেরাজিভ নিয়ে
সোহাগ-উদ্যত সেই যুবকের অধিকারে ছোবল দিয়েই
চলে গেছে অগস্ত্যযাত্রায়।

গুণিন বাঁচিয়ে দিল রোদ্দুর ছিটিয়ে আর
খবরের কাগজের হেডিং শুনিয়ে।

তারপর থেকে দু বছর
আঙুরবিরোধী হয়ে সেই যুবা জেনে বা না-জেনে
চাঁদকে বলেছে কাস্তে, কখনো বা ঝলসানো রুটি।
দু বছর মাছমাংস পেঁয়াজ রসুন মশলা না ছুঁয়ে তেল না মেখে
পাথরভাঙার জোর প্রতিযোগিতায়
নিজের দুখানা হাত করে তুলল হেঁতালের লাঠি।

কালাশৌচ কেটে গেলে কাগজে সে দিল বিজ্ঞাপনঃ
ডিভোর্সি পাত্রের জন্যে সবর্ণ কি অসবর্ণ পাত্রী চাই
দাবি-দাওয়া নেই।

দ্বিতীয় বিবাহে সেই দু বছর আগেকার বধূটিই ফিরে এসেছিল

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি, নীরা
এ-কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে

ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে এক মুহূর্ত ভাববে
কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে—তখন আমার
এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ড্যাস রেফ্
ও রয়ের ফুটকি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
আধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিঃশ্বাসের মতন নিঃশব্দ এই শব্দগুলি
এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুণিনের বানের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিদ্ধ করতে জানে।

তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ংকর হাত তোমাকে ছোঁবে না, এই মধ্যরাত্রে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও
চাপা আর্তরব তোমাকে ভয় দেখাবে না—আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতির আলোর মত ভদ্র হিম,
শব্দ ও অক্ষরের কবিতায়
তোমার শিয়রের কাছে যাবে—এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবে না, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়—তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের, প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো

বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্ণার জলের শব্দে
হেসে উঠবে, কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো মনে মনে
ঘর ভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
তুমি জানতে পারবে না—তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা।

বাজনা

কবিরুল ইসলাম

তুমি কি সেই বয়ঃসন্ধির নূপুর, যার শরীর
ছিলো
বাজনা, ছিলো মঞ্জু মঞ্জরি
নূপুর পায়ে বাজতে পারে সবাই
তুমি বাজতে নিজের জোরে, নূপুর

আজ সেই নূপুরই দুপুর ...
কত কী যে ভাঙতে গড়তে
গড়তে ভাঙতে
ভাঙতে ভাঙতে গড়া ঃ শোনো,
সেই নূপুরই বাজে—

বাজে, বাজে ভরতি দুপুর দূরে
নূপুর, তুমি নিজের জোরে নারী ।।

পুরনো গয়না

রবীন সুর

ঠায় উবু বসে থাকা, ব্যস্ততায় হাঁটু অব্দি কাপড় গুটনো।
আনাজ খোসার স্তূপে বটির ময়ূর দাঁত কুটনোয় বসানো, তার
দুধ-রঙ পায়ের ডিমের চেপ্টে-বসা নয়নশোভন মসৃণতা
জগদ্ধাত্রী উরু ছুঁয়ে সিঁদুর টিপের নাকে মুক্তো মুক্তো ঘাম।
ওদিকে গনগনে আঁচ ঝিক উপচে ক্রমাগত তাতাচ্ছে বাতাস :
তিজেল হাঁড়ির জলে চাল-ছাড়া চোঁ-চোঁ শব্দের গোঙানি—
নাদবুড়ো গন্ধের হাওয়া, হঠাৎ শরীর পেয়ে ছটফটায় বুজগুড়ি।

জিলিপির রসমাখা শূন্য শালপাতা, এঁটো চাটতে ওঁচানো শুঁড়ের
এক পা এক পা করে আরশোলার নোলা, সারিবদ্ধ গন্ধ-পিঁপড়ে মাছি,
চড়াই-এর চ্যাঁচামেচি লক্ষ্য রেখে মিনি বেড়ালের নিশ্চুপ ভিটকিলি—
ফ্যাসফেঁসে গলা নিয়ে ত্যাঁদোড় হুলোটা আছে নিত্য ল্যাংবোট।
জিজ্ঞাসা চিহ্নের ল্যাজ কুকুরগুলি ছায়া রোদ্দুরের হাত পা ছড়ালে
নর্দমার মাছধোয়া জল থেকে ত্রস্ত ডানা উড়ে গেল কাক।

পাড়াগাঁর গন্ধমাখা দুধপিসি, সকালের রোদে
ঝকঝকে কলসি নিয়ে এসেছিল ধুলোমাখা পায়ে—
টাটকা দুধের সঙ্গে এনেছিল কচি লাউ, ডিমে শাক, সজনের ফুল।
বাটনা-বাটা বউটিও কাজ সেরে চলে গেছে, শিলের ওপর
নিস্পন্দ নোড়াটি যেন উত্তরসঙ্গম তৃপ্ত সার্থক পৌরুষ
সমস্ত শরীরে তার অন্য গন্ধ অন্য বর্ণ ভিন্নতর স্বাদ।

আলো কম ছায়া বেশি ঘরটির কালো ঝুলে নীল ডুমো মাছি
অযথা ভনভন করছে মুক্ত হতে। স্থিতাবস্থা নিশ্চিতির বিঁড়েয় বসানো
বিশাল জালার মধ্যে গঙ্গাজল ফটকিরির রসায়নে, পাশে
গোটা কয় শীতল শশার মাঝখানে ফুটি ও তরমুজের উগ্র দলাদলি।
সাঁতলানো ডাল আর মাছভাজার গন্ধ, ফোড়নের ছোটাছুটি—
মধ্যাহ্ন এগোতে থাকে, সদ্যমাজা চকচকে কাঁসার বাসন
জলচৌকি জুড়ে আছে, নিচে তার আহ্লাদী আলুর গড়াগড়ি ;
এই সব ন্যাপথলিন গন্ধমাখা পুরোনো হলুদ রঙ দোমড়ানো ছবি
জংধরা ট্র্যাঙ্ক থেকে উঁকি দিল মধ্যাহ্নের স্থিত রোমন্থনে।

চাঁপার সিন্দুক

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ও বড়ো কোমল গিরিখাত
অনুপ্রবেশ করো ধীরে
আর্দ্র আনন্দের রেশ
না মিলায় রক্তিমে তিমিরে

ও বড়ো চাঁপার সিন্দুক
ওইখানে আপেলের খনি
চাড় দিয়ে খুলো না কো ডালা
আঁচড়ে আহত হবে ননী

ও বড়ো নরম জঙ্গল
আষ্টেপৃষ্ঠে আছে তৃণভূমি
কচি কচি কদম কেশর
তেমনই ভঙ্গিমা করো তুমি

ও পথ তো গোলাপেরই পথ
পাপড়ি মতো মসৃণ
ভোমরার মতো আচরণে
বিচরণ করো চিরদিন

বিনয় মজুমদার

তুমি যেন ফিরে এসে পুনরায় কুণ্ঠিত শিশুকে
করাঘাত ক'রে ক'রে ঘুম পাড়াবার সাধ ক'রে
আড়ালে যেও না ; আমি এতদিন চিনেছি কেবল
অপার ক্ষমতাময়ী হাত দু'টি, ক্ষিপ্র হাত দুটি—
ক্ষণিক নিস্তারলাভে একা একা ব্যর্থ বারিপাত।
কবিতা সমাপ্ত হতে দেবে নাকি ? সার্থক চক্রের
আশায় শেষের পংক্তি ভেবে ভেবে নিদ্রা চ'লে গেছে।
কেবলি কবোষ্ণ চিন্তা, রস এসে চাপ দিতে থাকে ;
তারা যেন কুসুমের অভ্যন্তরে মধু-র ঈর্ষিত
স্থান চায়, মালিকার গাঁথা হয়ে ঘ্রাণ দিতে চায়।
কবিতা সমাপ্ত হতে দাও, উত্তেজনা শীর্ষলাভ করে,
আমাদের চিন্তাপাত, রসপাত ঘটে শান্তি নামে।
আড়ালে যেও না যেন, ঘুম পাড়াবার সাধ ক'রে।

শিল্পীর স্পর্শ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

তুমি যাকে স্পর্শ করো সে-পাথর শব্দ হয়ে ওঠে
কোণার্কে, সাগর তীরে, খাজুরাহো কিংবা অজন্তায়
যত দৃশ্যবর্ণে গন্ধে নয়নাভিরাম হয়ে ফোটে
তোমার প্রাণের পুণ্য দুঃখের অচির মৃগয়ায়
সময়কে বেঁধে রাখে কালজয়ী মহিমার রূপে ;
ইতিহাস জানে না তা ; যে-কাহিনী বণনাবিহীন
অথচ নিসর্গে জ্বলে অতীন্দ্রিয় প্রেরণার ধূপে ;
দু-চোখের নিবিড়তা আজ শুধু জেনে রাখো ঋণ।

চতুর্দিকে শিল্প আছে। যদি বুকে তৃষ্ণা রাখা যায়
জন্ম, মৃত্যু, ভালবাসা ফুটে থাকবে পাশের বাগানে,
শুধু তুমি একবার দুর্লভ দীক্ষায়
তাকে স্পর্শ করে বলো, "প্রেম সব সমাধান জানে।"

তারপর চেয়ে দেখো সূর্য কোথা শেষ পদ্মে ফোটে
তুমি যাকে স্পর্শ করো ; সে-পাথরে গান বেজে ওঠে।

অধমর্ণ

মানস রায়চৌধুরী

সাত রাত্রি বুকের মধ্যে থাকবে বলেছিলে
    প্রতিশ্রুতি জানলা ভেঙে চন্দ্রালোক চুরি করেছে—
মেঘের নীচে প্রস্তুতিহীন সহবাসের মধ্যে ভাবছি
    কোথায় সেই সাত রাত্রি, অশৌচ পালন তিন রাত্র।

সমস্ত ঋণ মুহূর্তের কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে রাখে
    কে না জানে তোমার কাছে আমার অধমর্ণ থাকা
এক জীবনে ফুরোবে না, পাঁচটি জীবন পেলেই খানিক
শুধতে পারি, প্রতিশ্রুতি জলেস্থলে রটতে থাকে।

মেঘের নীচে বিনা তাঁবুর গোপনতায় রাত কাটছে।
মেঘের ওপর চাদর টেনে লুকোই এসব লাজলজ্জা
গান গিয়েছে খুঁজতে গায়ক, বুকে শুধু শ্রোতা ঝিমোয়
থামার মন্ত্র কে জানবে, সাত রাত্র কণ্ঠলগ্ন
থাকার প্রতিশ্রুতি এখন লুঠ করেছে চাঁদের আলো
তোমায় ডাকলে প্রতিধ্বনি উপত্যকায়
নিজের কাছে নিজেই থাকছি অধমর্ণ।

তুমি প্রেম তুমিই জীবাণু

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

তোমাকে বসিয়েছিলাম উৎসবের সব থেকে উজ্জ্বল আসনে
তোমার পায়ের নিচে রক্তাভ কার্পেট ছিল ক্রীতদাস
তোমার তীর্যক দেহ আলো নিচ্ছিল হৃৎপিন্ড জ্বালিয়ে
তোমার দুলের দীপ্তি তীক্ষ্ণধার বর্শার ফলকে
আমাদের হত্যা করে স্তনতটে রেখেছিল তাপ,
তোমাকে ঘিরেই আমরা আমাদের স্বপ্নে ছিলাম আচ্ছন্ন।
তোমার ভ্রূভঙ্গীর সূত্র ধরে নক্ষত্রের আলো দেখছিল পথ
কর্কশ পাথর কেটে তোমার নিঃশ্বাস যেন ফোটাচ্ছিল উদ্ভিন্ন গোলাপ
আমাদের পিপাসার্ত কণ্ঠে তুমি ঢেলে দিয়ে উষ্ণতম মদ
সমস্ত উৎসব রাত্রি করেছিল জীবন্ত ও তাজা।
তোমার দেহের গন্ধে দর্পিত সিংহের মত ভেবেছি নিজেকে
তোমার জন্যেই গড়ে তুলেছিলাম প্রতিদিন রাজধানীর নতুন প্রাসাদ !
তোমার ইঙ্গিতে আমরা খুনীর মত নির্দয় হতে পারতাম যে কোনদিন
আমরা সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ এই রাঢ় বঙ্গে তলিয়ে যেতাম কোথাও
অথবা সংসার পেতে জীবনের স্তব্ধতায় সাধারণ মানুষের কাছে
অকিঞ্চিত দিনযাপনেও এতটুকু অনিচ্ছা হ'ত না ;
তুমি যদি একবার বলতে আমাদের রক্ত-মাংস ছিন্ন করতে চাও
তাও পেতে, তোমার জন্য কবিতায় নতুন শব্দের জন্ম হ'ত।
তোমার জঙ্ঘার কাছে পৃথিবীকে গুটিয়ে দিতাম অনায়াসে
তোমার বুকের মধ্যে দিতে পারতাম বিভিন্ন গ্রহের জ্যোৎস্না এনে
তোমার জন্যেই অমনস্ক প্রত্যেক বাজীতে আমরা হেরেছি
তোমার ছায়ায় বসে দিন গেছে অর্থহীন অথচ মধুর
তুমিই আমাদের নির্বাচিত করেছিলে বিক্ষিপ্ত অরণ্য থেকে ঘরে
আর উৎকণ্ঠিত করেছিলে ভিন্ন এক যন্ত্রণার দিকে।
তারপর আমাদের রক্তে দেখলাম প্রথম জীবাণু
উর্ধ্বগ সেগুন-শীর্ষে দেখা দিল মৃত্যুর বরফ
আমাদের ত্বকে এল পশ্চিমের অন্ধকার রঙ
তোমার নখের কোণে লেগে ছিল আমাদের নিহত অভিলাষের রক্তকণা
তোমার পায়ের কাছে অবিশ্বাস ঘুরছিল নির্ভয়ে,
আমাদের নিষ্ঠুরতা নিভিয়ে দিল উৎসবের সমস্ত আলোক
আর তোমার বিষণ্ণ কান্নার শব্দে ডুবে গেল প্রার্থনা ও ধূপ।

মেরুণ রঙের এক্কা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমরা দুজন
চড়ব এখন মেরুণ রঙের এক্কা।
সে-গাড়ি টানবে ছোট্ট একটি টাট্টু,
তার রোগা পিঠে জুড়ে দেব একজোড়া
পোক্ত বাদামি ডানা—
শূন্যে ভাসব দোক্কায়।
আগেভাগে চলে গিয়েছে টেলিগ্রাম
সোনামুগ—রঙা মেঘে।
ভাতের গন্ধে ঠাসা আকাশের
গোর্খালাইন ডিঙিয়ে
কাঁপা ছায়া ফেলে তির পুণ্যির মাঠে
মেরুণ রঙের এক্কায়
সব উজিয়ে যেতেই হবে—
চলেছি জোড়ায়
ঝাঁপ দিতে ভরা নীলিমায় মোচ্ছবে।

চক্রী পাহাড়, গূঢ় অভিলাষে ঠাসা অরণ্য পেরিয়ে
দ্যাখো, কী সাবাস ছুটছে আমার টাট্টু!
আহা, কতকাল তাকে ডাঁটো করে তুলেছি গোপন স্বপ্নে
তার রোগাপিঠে বুনেছি ডানার ইচ্ছে।
কে নুলো বাড়াও—অভাব তো সব খায় না,
অসম্ভবের বায়নায়
সাজানো তাসের শয়তানি ছিঁড়ে
লাফ দিয়ে ওঠে টেক্কা,
তুখোড় কদমে কদমে
তারামণ্ডল মাড়িয়ে ছুটেছি মেরুণ রঙের এক্কায়।

ছায়াসুন্দরী

তারাপদ রায়

দিনকাল এমন হয়েছে যে
আমার নিজের ছায়া পর্যন্ত
আমার সঙ্গে থাকতে চায় না।
এক পাশ থেকে আমাকে ভয়ে ভয়ে দেখে,
দেখে কি করছি, কোথায় যাই
একেক সময় মনে হয় এখনই বেঁকে বসবে,
আমার সঙ্গে থাকবে না,
আমার সঙ্গে কোথাও যাবে না।
শ্রীমতী ছায়াসুন্দরীকে আমি অনেক বোঝাই,
তাকে বলি,
'দ্যাখো,
আমার সঙ্গে থাকাই তোমার একমাত্র কাজ,
তুমি ইচ্ছে করলেই
যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো না,
যা ইচ্ছে করতে পারো না।'
শ্রীমতীকে আমি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করি,
'আমার এপাশে কিংবা ওপাশে
বড় জোর সামনে বা পিছনে থাকা ছাড়া
তোমার কোনো উপায় নেই।
ঐ নদীর তীরে পলাশবনে সবুজ ও লাল
ঐ পাহাড়চূড়ায় ঝর্ণার জলে সূর্যাস্তের সোনা
আমি বুঝতে পারছি, সবই চমৎকার।
কিন্তু আমি যদি না যাই
তুমি ইচ্ছে করলেই যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো না,
যা ইচ্ছে করতে পারো না।'
অভিমানিনী ছায়াসুন্দরী দাসী
মাথা নিচু করে নিরুত্তর বসে থাকে,
কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হয়,
আমিও মাথা নিচু করে নিরুত্তর বসে আছি।

জলের পরতে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলমিলতা ভেসে এল পুকুর-ঘূর্ণায়, পায়ে উঠে
বলে গেল ও পাড়ের বনজ খবর। খুব ছায়া
ঘেরাটোপ ধরে আছে মনে মনে। কলস-উপুড়
ভেসে যাওয়াটুকু ধরে রেখেছে সুপুরিবন, দিল
হাতে তুলে। দু-হাতের পাতা ভিজে যায়, গলা বেয়ে
ওঠে সুখ নিস্তাপ বিষাদে—চুপি চুপি নেশা-লাগা
চোখ বুজে বুকের ওপর পেতে চাই সব ছোঁয়া ···
পানবোঁটায় ভরা ছিল ভাব, জিভে কামড় লেগেছে ;
চোখ বুজে টের পাই রক্ত আর আগুন একই সাথে।
ধিকি ধিকি উড়ে আসে তামাটে-রক্তিম চৈত্রবেলা,
বয়ে আনে মুক্তোর ঝুরির মতো ঝরা পাতা—তার
ইতুভাস্করের ঘটে বেঁধে দেওয়া একগাছি চুল।
কলমিলতা ভেসে যায় জলের ঘূর্ণায়, সে তোমায়
জলের পরতে মুড়ে ডুবে গেছে অজান্তে কখন ···
'কেবল দেখেছে শিয়রলতা'।

শুক্লা অথবা কৃষ্ণা-কে না-কি শুধুই কণা

সামসুল হক

প্রথম চুম্বনে তুমি মৃত্যু দিয়েছিলে   দ্বিতীয় চুম্বনে শবাসন
তৃতীয় চুম্বনে তুমি আমাকেই করে নিলে নিজের শাসক
পাবনবাতাস তুমি
        এইবার জেনে নাও নক্ষত্রযুদ্ধের পরিণাম
জেনে নাও বিজ্ঞানের মহত্তম আবিষ্কার পুট্‌পুট্‌ বোতাম

কৌলিক ধারায় আমি প্রজাদেরও   তোমাকেও
        শাসনের ভার দেবো একান্তরভাবে
পূর্ণিমার রাত্রে যদি আমাকে গুহায় বন্দী রাখো
অমাবস্যা জেনে যদি সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও আমার শরীর
আমার শাসনদণ্ড চিরস্থায়িভাবে
তোমাকে অর্পণ ক'রে   সব সজ্জা ছেড়ে-ছুড়ে
                    তোমার নির্ঘুমে চলে যাবো
আর যদি মিথ্যা বলি একবার ভুল হবে একবার ভুল করো তুমি
ভুল ক'রে নিজের অক্ষয় স্বত্বে জাগো

আশ্চর্য   তোমার নাম এখনো জানি না আমি
                              শুক্লা না-কি কৃষ্ণা

২

অনেকক্ষণ প্রেমের পরে ওড়ার সময় কণা বললো
দু-মাস পরে নীলাদ্রিকে বিয়ে করবো

সেই নীলাদ্রি যাকে বলতুম জলের রাজা
নীলাদ্রি তো অনেক আগেই ইনফ্যানট্রিতে যোগ দিয়েছে
কণা থামো

সপ্তর্ষিমণ্ডল পেরিয়ে কণা তখন উড়ে যাচ্ছে

কথাবার্তা

বাসুদেব দেব

রাঙা, তোমার মনে আছে সেই সব টুকরো কথা ?
মামুলি সব কথাবার্তা, ঘরসংসার,রাস্তাঘাট,বন্ধু-বান্ধব
ভোট আর অগ্নিকান্ড, কেন্দ্ররাজ্যের লড়াই, অফিস পলিটিকস
লোডসেডিং আর খরা
সামান্য ভঙ্গিবদল
তোমার কপালের ওপর উড়ে আসা চুল
পথে যেতে আমাদের দুজনের অনেক কিছু
কুড়িয়ে নিয়ে গেছে হাওয়া
সেই সব গাড়ির শব্দ মানুষজনের ভিড় চেঁচামেচির মধ্যে
দু একটি কথা, তোমার মনে আছে রাঙা ?

তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে শিখিয়েছ, তোমার চোখে ছিল
নদীর ফেরিঘাটের আলো
আমি তোমাকে চিনিয়েছি গাছের স্বভাব, বিশ্বাস আর ছায়া
সেই সব টুকরো কথা, চকিত হাসি, সামান্য ঝগড়া
হঠাৎ করে ঘনিয়ে ওঠা দুঃখ, আজ আর আমাদের নয়
অথচ আমাদেরই ছিল, পেয়ালা থেকে চলকে-পড়া চা
হাতের তেলোয় মৌরি, সেই সব শব্দ বিনিময়, মিনিবাসের টিকিট
নতুন হয়ে উঠছে অন্য কোথাও আজ
বালি খুঁড়ে খুঁড়ে একদিন কেউ খুঁজে পাবে সেই সব কথার অর্থ
আমাদের পিপাসা, অসমাপ্ত কথা আর নিঃশব্দ স্পর্শের তর্জমা

তোমার মধ্যে আমার এক টুকরো, আমার মধ্যে তোমার,এক টুকরো
বাঁকানো ছুরির মত বিঁধে আছে আজ,
ক্রমশ মধুর ও বিষিয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে
সেই সব টুকরো কথা ভঙ্গিবদল, তোমার মনে আছে, রাঙা ?

আমার চুম্বন

বিনোদ বেরা

সমুদ্র আছড়ে পড়ছে বালুতটে, ঢেউ এর মাথায়
বেশীক্ষণ চোখ রাখা যায় না—এমন
দাউ দাউ রুপো ! তীব্র জলের রহস্যে অন্যমনস্ক। হঠাৎ
তুমি শূন্য থেকে নাকি মাটি ফুঁড়ে !
অতীতের মায়া থেকে উঠে এসে বুকে,
সচমকে বেজে ওঠো—কি আশ্চর্য তুমি ?

ষোলো বছরের পর দেখা হলো
আমার বাড়ানো হাতে মিললো এসে হাত।
এই হাত সপ্রতিভ, এই হাত থরো থরো ব্যাকুল না,
অনুষ্ণ, অচেনা।

তোমাকে নতুন করে অনুভব করে নিতে গিয়ে
কেমন বেসুরো বাজে—কই সুশ্রী আরক্ত সে ওম !
কই সেই বিদ্যুৎ সঞ্চার !
কেঁপে ঘেমে পুষ্পক পুলকে জ্বলে ওঠা !
কোন কথা কোনও সংকেত নেই,
এই হাত স্থূল ও নির্বোধ।

হাত ছেড়ে দিয়ে বলি-ভালো আছো ?
তার মুখে প্রতিধ্বনি।
তার ওষ্ঠ কপোলের লাবণ্যাভা ক্ষণিক প্রলব্ধ করে,
ষোলো বছরের আগে ফিরে যাই,
আদরে আপ্লুত করতে হতে ইচ্ছে করে—
আমার চুম্বন তার চাপা হাসি মুখ ও চোখের
হ্যাঁ না র দ্বিধায় থমকে যায়।

সিঁড়ি

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

হাসপাতালে শুয়ে থেকে কাটলো তো কদিন
কেমন আছেন ?
ডাক্তার, নার্সকে বলুন মন দিয়ে অসুখ সারাতে
আপনি এখনও মূল্যবান।
দক্ষিণের হাওয়া-লাগা বিশাল ঘরটি আপনার
সে কি খালি ? ছোটরা বিষণ্ণ খুব ?
নিশ্চয় ততটা নয়, আপনাকে সুস্থ করে তোলা—
সেজন্যেই হাসপাতাল।
চটপট সেরে উঠুন, বাড়ি ফিরতে হবে
দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে
স্বাগত জানাবে হাওয়া আলো
স্নেহের সংসার বসবে ঘিরে !
সন্ধে হলে আমি যাব
সিঁড়ি টপ্‌কে বিস্তীর্ণ মাঠের মতো ঘর
ঢুকতেই 'এই যে মেমসাহেব' শুনে নির্ভয়ে বসব দরজা ঘেঁযে
গল্প হবে রাত অব্দি, আপনি আর আপনার সংসার
এবং দরজা ঘেঁযে একমাত্র দূরাগত আমি।

ভালোবাসতে দিলি না রে

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

কতই দিলি, কেবল আমায় ভালোবাসতে দিলি না রে·
সন্ধে অব্দি সঙ্গ দিলি টুকরো কথার হাজার মালা
ছড়িয়ে গেলি তেপান্তরে শুকনো ঘাসে বাসি বকুল
দু'পায়ে তুই মাড়িয়ে গেলি, মাড়িয়ে গেলি হৃদয়হীনা
ঊর্ধ্ববাহু ভালোবাসায় একটু মেঘের জল দিলি না ····

আসলে তোর বুকের তলায় ভীষণ কিছু ইঁদুর থাকে
আসলে তুই ফসল-কাটার মাসেই করিস ঘোরা ফেরা
আসলে তোর গোপনতার আহরণের ভাঁড়ার হ'তে
শস্য কিছু গড়িয়ে পড়ে সবুজ হওয়ার লগ্নকালে
অবহেলায় বিজ্ঞপিত সর্বনাশের প্রতিশ্রুতি।

অথচ তুই সব দিয়েছিস, যুগল ঢেউ-এ বুকের শোভা
নৃত্যপরা নটীর মতো অঙ্গ-ভরা স্বেচ্ছাচারও
এবং কিছু শুকনো হাস্য, বন্ধুবিহীন প্রগল্‌ভতায়
ঘনিষ্ঠতম স্পর্শটুকু নীরন্ধ্র কোন্ ঘরের কোণে
সবই দিলি, কেবল আমায় ভালোবাসতে দিলি নারে!

বিবাহ বার্ষিকী

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি ছিল গ্রহণের, অন্যটি সমর্পণের,
একটি ছিল আশ্বাসের, অন্যটি প্রত্যাশার
একটি ছিল স্বপ্নে উদ্বেল, অন্যটি সংকল্পে উদ্যত

একটি হাত ছুঁয়ে ছিল অন্য একটি হাতকে

এই মুঠিতে অভিমান, ওই মুঠিতে জয়,
এই মুঠিতে উদ্বেগ, ওই মুঠিতে উদ্ধার,
এই মুঠিতে পিপাসা, ওই মুঠিতে আমন্ত্রণ

একটি হাত ছুঁয়ে আছে অন্য একটি হাতকে

একটি আঙুল শুশ্রুষার, অন্যটি সাফল্যের,
একটিতে বর্তমান, অন্যটিতে অদেখা দিন,
একটি ছুঁয়ে আছে স্নেহ, অন্যটি উত্তরাধিকার

দশ আঙুলে বাঁধা পড়ে গেছে দশটি দিগন্ত
একটি যুগ এক যুগান্ত, অনন্তকাল।
আমরা ছুঁয়ে আছি পরস্পর পরস্পরকে।

একটি হাত ছুঁয়ে থাক অন্য একটি হাতকে

প্রেম

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রেম আসে, বুকের পাথর স'রে যায়,
প্রেম যায়, বুকের পাথর ভিড় করে।

পৃথিবী যে কারো কারো কাছে
খুব সুন্দর জায়গা, তাতো তুমি বুঝে উঠতে পারো।
একটানা অন্ধকারে চোখ রেখে দিলে
মাঝে মাঝে দু'একটি আকার উঠে আসে।
একটি তরুণী আজ মাঝরাতে একলা বাড়িতে রয়েছে।
বেণী বাঁধবার ছলে, সমস্ত আয়নার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
কে দিয়েছে তার বুকে ঢেউ, কে তার নয়নে
আলো জ্বেলে দিলো ?

এ-ই প্রেম, এই শুধু আড়ালে আড়ালে
কাজ করে ; সময় ফুরোলে, খ'সে পড়ে।

পাথরখণ্ডগুলো আস্তে আস্তে স'রে যায়,
স্রোত পালটিয়ে গেলে ফের ফিরে আসে।।

রাক্ষস

উৎপলকুমার বসু

সেদিন সুরেন ব্যানার্জি রোডে নির্জনতার সঙ্গে দেখা হ'ল।
তাকে বলি : এই ত্যো তোমারই ঠিকানা লেখা চিঠি, ডাকে দেব, তুমি
মনপড়া জানো নাকি ? এলে কোন্ ট্রেনে ?

আসলে ও নির্জনতা নয়। ফুটপাথে কেনা শাস্ত নতুন চিরুনি।
দাঁতে এক স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কালো চুল লেগে আছে।

ঈশিতা

রথীন্দ্র মজুমদার

বহুদূর থেকে আজ চিঠি লিখছি, ঈশিতা, তোমাকে
কতকাল ? ঝাউগাছ তোমার জানলায় বাতাস
আজো ঝিরঝির কাঁপে ? গ্রীষ্মের রোদ্দুর তোমার
মসৃণ ত্বকে ঝিলিক দেয় ? মনে পড়ে
সেই বাগানের দোলনা, শাড়ির আঁচল উড়ে যায়
দূর, বহুদূর, সমুদ্র লবণের গন্ধ নিয়ে আসে
ঝিনুক খেলার দিন, নিয়ে আসে স্বপ্ন, দ্বিপ্রহর
শরীরের গন্ধ বহুদূর থেকে আমি টের পাই
শালপাতা ঘাসের ওপর কেঁপে ওঠে, ঈশিতা
উড়ে আসে এরোপ্লেন, বিস্মৃতির শব্দ
উড়ে আসে কবেকার কষ্ট, তোমার দু'চোখ
একদিন রঙিন ছাতার বারান্দায়
উঠে এসেছিলো. ঘাসে চিক চিক করছিলো তোমার
মুখ, আমি শুধু তাকিয়ে থেকেছিলাম, আজ
চিঠি লিখি আর সেই কষ্ট ফিরে আসে
ফিরে আসে ঘ্রাণ, স্বাদ, গন্ধ, স্বপ্ন
ফিরে আসে আমার না-লেখা কবিতার
কবেকার চিঠি, ডানার পালকের
উষ্ণ তাপ, ফিরে আসার দিন, ফিরিয়ে আনি তাকে
বহুকালের সেই ঝির-ঝির ঝাউয়ের যে আর ফিরে আসার নয়।

রাত্রিবাস

রত্নেশ্বর হাজরা

ধরেছি রাত্রির মুখ দু'হাতের মাঝখানে—তারপর
অধরে তুলেছি—
রাত্রি জানে এ-পীড়নে ব্যথা নেই অন্য কিছু
মায়া ও মমতা লেগে আছে
মানুষের গন্ধ আছে— মুখের নিঃসৃত লাল আছে
নিশ্বাসে রয়েছে গন্ধ ফুসফুসের
রক্তেরও রহস্য লেগে আছে—।

এখন রাত্রির দেহে প্রতিধ্বনি নড়ে যায় যেরকম
শব্দ নড়ে শংখের ভিতর
যেরকম মুক্তো নড়ে ঝিনুকের গর্ভে ও অস্তিতে
সামান্য হাওয়ায় নড়ে তিলফুল যেরকম
গাছের গর্তের মধ্যে পাখিদের ডিম ফেটে অন্ধকার নড়ে।
দু'হাতে ধরেছি কিছু সেরকম নড়াচড়া তারপর
ধরেছি অস্তিত্বময় অন্ধকার কিছু
তুলেছি ঠোঁটের কাছে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা তার
মাংস আর স্নায়ুদের নির্জন দাহিকা—
পোড়ে না শরীর—শুধু জ্বলে যায় এ-দহনে ....
একটা চৈতন্য থেকে আরেক চৈতন্যে যায় ঘ্রাণ
এবং নড়ে না অগ্নি সেই চলাচল থেকে
রাত্রি কি বোঝে না কিছু! বোঝে
এ-পীড়নে ব্যথা নেই
মায়া আছে তাপ আছে
রক্তেরও রহস্য লেগে আছে—

আজো ঠিক

আশিস সান্যাল

আজো ঠিক ভোর হয়—
যে-রকম ভোর হতো এক কোটি বছরের আগে ;
তারা ফোটে অন্ধকারে।
সুবর্ণরেখার তীরে প্রাকৃত স্বভাবে
উড়ে যায় প্রজাপতি ;
হাওয়ায় স্পন্দিত বুকে পৃথিবীর চোখে নামে ঘুম।
আজো ঠিক ভোর হয়—
ভেঙে যায় নির্ধারিত রাতের নিঝুম।

বয়স গিয়েছে বেড়ে।
কৈশোর যৌবন,
অতিক্রান্ত হয়ে তবু অন্তর্গত বেগবতী মন
বিস্ময় জড়িত চোখে
দূর থেকে দূরে
দেখে কোন্ অস্তিত্বের গাঢ় অন্ধকার ?
সর্বত্র ছড়ানো মেঘ,
মেঘের ভেতরে
এ কোন্ দিনান্ত-রঙে ধূসর বিস্তার ?

তবু আজো দেখি প্রয়োজন
পুরুষের কাছে প্রিয়
দুগ্ধবতী রমণীর স্নেহে আর্দ্র মন।
এখনো নারীর কাছে
একটি পুরুষ,
অনেক বিজয় থেকে আরো বেশি দামী।
আজো ঠিক ভোর হয়—
হীরের পাপড়ি খুলে ফুল দেয় আশ্চর্য প্রণামী।

ঘরসংসার

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

পাড়ার তিনটি যুবক এসে কুসুমকুমারীকে
নিয়ে গেল দিঘির পাড়ে, অন্ধকারে
        নষ্ট করলো তাকে—অস্ত গেল চাঁদ,
দিগন্তে মেঘ গর্জে ওঠে, খড়্গে আকাশ দু'ভাগ করে ঝলসে দিলো
মুখ ফেরালো মানব সমাজ, ভ্রষ্ট হোলো রুচি
রাত্রি ভেঙে বৃষ্টি নামলো, কুসুম হোলো শুচি।

কনে দেখা আলোয় যখন মূর্ছা চারিদিকে
শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলবো স্পষ্ট মেয়েটিকে,
ভালোবাসবো আদর করবো তুমুল ঝগড়া ঝাঁটি
বুকের মধ্যে পেতে রাখবো মিষ্টি শীতল পাটি,
সারা শরীর মুছিয়ে দেবো নিত্যি স্নানের পরে
টেবিলক্লথের নক্‌শা হবে পরামর্শ করে,
এলোচুলের গন্ধ ঘিরে মুখ ঢাকবো বড্ড অভিমানের,
বাছাই করে রেকর্ড কিনবো রামপ্রসাদী গানের,
সময় হ'লে উল বুনবে যাবে বাপের বাড়ি,
খোকাখুকুর নামের জন্য দেখবো ডিকশেনারি,
তাতেও যদি খুশি না হয়, বেদীর উপর তুলে
লাল চেলিতে সাজিয়ে দিয়ে রক্তজবা ফুলে
পুজো করবো, নাচবো গাইবো কাঁদবো সারারাত
আঙুল কেটে টিপ পরাবো, কামড়ে দেবো হাত।

তাকে নিয়েই ঘরসংসার
ইচ্ছে করলে বদলে দিতে পারি—
ইচ্ছে করলে সমস্ত ঘরবাড়ি
ভেঙে আবার তৈরী ক'রে আবার ভাঙতে রাজি,
নইলে যে তার মন ওঠেনা, জানিনা মান কিসে
আমার বুকে আকাশপাতাল পিষে
গয়নাগাটি বিলিয়ে দিয়ে অমাবস্যার আঁধার নিয়ে
নিজের মুখে কচাৎ করে তেষ্টা মেটায়
শেষ তিমিরে ফিনকি দিয়ে ছড়ায় আতসবাজি।

আমার সবই পড়ে রইলো, দরজাটি আধখোলা,
পাশের ঘরে কুসুম নেই, নিঝুম, শিকল তোলা,
পেছন থেকে জ্যোৎস্না এসে বাগানে পুবদিকে
মুখে রুমাল গুঁজে দিলো কুসুমকুমারীকে,
তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। এখন ভয়ে থাকি
হঠাৎ যদি অন্য কাউকে ভুলের বশে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে
কুসুম ব'লে, কুসুম, কুসুম, কুসুম বলে ডাকি !

ডুমুর
নবনীতা দেবসেন

আবার যদি ফিরতে চাই এই দরদালান
এই বাগানকুঠি ছেড়ে তোমার ঐ ডুমুর গাছের
ছায়ায়, বন্ধু, তুমি কি আমাকে জায়গা ছেড়ে
দেবে ?
পথের শেষ নেই, এই দরদালান অনন্ত, এই
বাগান সীমাহীন, এতগুলো থাম তুমি জন্মেও
দেখোনি, এত শিউলি, এত যুঁই, এত আম,
জামরুল, এত আমি—এ তোমার সবগুলি
চোখ একসঙ্গে মেলে দিলেও ধরা পড়বে না,
এত পায়রা আসে এ-বাড়ির ছাদে, এত
খরগোশ এ-বাগানের গর্তে-গর্তে, বন্ধু, তোমার
ডুমুর গাছের ছাউনি থেকে তুমি এর কণাটুকুও
জানতে পাবে না—এত বুড়ো-বুড়ো কালবোস
এদের কালো দিঘিতে !
সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, দিনরাত পথ চ'লে,
দিনরাত দিনরাত সব পথ একা চ'লে-চ'লে
যদি আমি ফের ফিরতে চাই, বন্ধু, তোমার
ডুমুর গাছটি কি আমাকে ছায়া দেবে ?

তবুও

তুষার রায়

সে নারীকে আর আমি দেখিনি কোথাও, কোনখানে
যার চোখে, পক্ষে যেন জেগেছিলো ঘুমন্ত মিশর
তারপর ল্যাব্রাডর প্রণালীর আঁধারে আঁধার
যেন ভেসে যায় গাল্‌ফস্রোতে দূর কানাডায়,

আমাদেরও গ্রামের ভিতরে গ্রাম ছিলো, শোনো
বুকের ভিতরে ছিলো প্রেম, আমাদেরও
বালুচ সেনার মতো কোনো সুঁচ ফুটেছে সেখানে,
ভোরের পাখালি তুমি ডেকে যাও ফিরে।
ফিরে ফিরে তবু নাচ, গান গায় মাড়িয়া যুবক
ধ্যানী বক চুপ থাকে মাছের সন্ধানে, কেননা
তাদের নেই জাল
আমাদের জাল আছে, হরেক রকম জেনো তুমি
জাল নোট, জাল ওষুধ, শিশুদের দুধ
তাতেও তো জল মানে জাল, তবু জ্বাল দিলে
জল মরে দুধ হয় খাঁটি, তবুও সোনার
বাটি কোথা পাবে
কোনদিকে যাবে প্রেম ভেবেই পায় না
নেকড়ের চেয়ে বড়ো চিতা ও হায়না
সবই আছে জেনে তবু তোমার কুকুর
—ভাদ্রমাসে জোর প্রেম করে।

অপেক্ষা

দিব্যেন্দু পালিত

অন্যমনে একদিন ভালোবাসা কড়া নেড়ে যাবে ;
অপেক্ষায় থেকো।

পদশব্দে মনে হবে বাতাসের নিষ্ঠুর শাসানি
বহুদূরে শান দিচ্ছে ভয়ানক কৌতুকের থেকে।
তোমার দু'পাশে রাস্তা, সাজানো হর্ম্যের
অলিন্দ থম্‌কে আছে, চারিদিকে আলোর চাতুরি ··

স্বপ্নের ভিতর কিংবা মৃত্যুর ভিতর কিংবা
জাগরণে, সূর্যের ভিতর
একাকী, নিঃসঙ্গ, এই আত্মঘাতী শোকের ভিতর

থেকো, তবু অপেক্ষায় থেকো।

অনুভব

দেবদাস আচার্য

সকালবেলায় সব কিছুই অল্প অল্প করে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে
ছুতোর কাকা র‍্যাঁদা, বাটালি আর তুরপুন হাতে বেরিয়ে পড়েন কাজে
করমালি চাচার হাতে ওলন-দড়ি
মাধব-জ্যেঠু দুটো বলদ আর বিদে নিয়েছেন সঙ্গে
আমার বাবাও সাইকেলে চাপেন
তার কেরিয়ারে থাকে রুটি, আলুচচ্চড়ি আর কাপড়-গামছার বোঁচকা
মা আর আমি বাবার যাওয়া দেখি, বাবা
ধুলো-মাটির পথে এক সময় মিলিয়ে যান
সারা দুপুর প্রখর রোদ্দুরের মধ্যে মা সংসারের কাজ করেন
আর বিড় বিড় করে মাঝে মাঝেই বলেন,
তুই জানিস খোকা, হাটে ছায়া আছে তো ?

যখন ডাঙা ছিল

কেতকী কুশারী ডাইসন

যখন ডাঙা ছিলো,
তুমিও দুর্লভ ছিলে না,
ধুলো উড়িয়ে তোমার দেহলীতে পৌঁছে যেতাম।

তারপর একটা সময় এলো
যখন ডাঙা রয়েছে,
কিন্তু তোমার ঘর ফাঁকা।
তখন ধুলোই আমার পথ, পাথেয়, এবং পথের শেষ।

এখন ডাঙা নেই,
তুমিও ফেরার,
দিগন্তের নারকেলগাছগুলো পর্যন্ত শুধু বানের জল।

লগি ঠেলে ঠেলে
জল বেয়ে চলি
হাজার নৌকার হট্টগোলে,

যদি দৈবাৎ
তোমার তক্তার সঙ্গে
আমার তক্তার
ঠোকাঠুকি হয়ে যায়।

এখন শুধু একটা লাইনই খোলা আছে,
ছেদহীন জলের লাইন।

আলো নিভে আসে।
জল ওঠে পাটাতনে।
নিশানাস্বরূপ
গাছ আর কুটিরের ডুবু-ডুবু গোল মাথাগুলোর
হদিশ মেলে না।

রাত্রির নৌবিদ্যা জানা নেই,—
চতুর্দিকে সামাল সামাল রব।

ঘাট হয়ে ফিরে এসো।।

খোলো, ও মোহ আবরণ

দেবী রায়

সময়-সুযোগ পেলেই একঝলক
তুমি তাকাও
বারেক, দেখে নাও

তড়িঘড়ি, শাড়ি-ব্লাউজ-ব্রার কথক
নৃত্যে, গর্বোদ্ধত—আড়াল থেকে
যতটুকু প্রকাশ, মাঠের সবুজ শস্য ....

তোমার শরীর, একান্ত যা নিজস্ব ....
নিষেধ করে যথাতথা, মদ্যপানে
যা শুধু আমাকে, যা শুধু আমাকে
নিবিড় ভাবে, নিয়তির মতো কাছে টানে

আধোঘুমের অস্পষ্টতায়
চুপিচুপি, বলি কানে কানে
দ্যাখাও তোমার শরীর
খোলো, ও মোহ আবরণ ...

দাও, উজাড় করে দাও—
তুমি তুলে ধরো
এই নিঃসঙ্গ হাওয়ায় ;

আমি কেঁপে কেঁপে উঠি
আক্ষেপে, অসহ্য আকাঙ্ক্ষায় ....
এখন, এই রাত্রির আড়ালে
আবডালে
সাবধানে ....

আমাদের দ্যাখে না কেউ
না সূরজ, না চন্দ্রিমা
কুচক্রী এক বাতাস শুধু—
পাঠায়, অচিনপুরের সামুদ্রিক ঢেউ ·

সবাই ঘুমায়, শুধু এ রাত্রে জাগে
এক জোড়া—যৌথ শরীরের কথকতা
দ্যাখাও, তোমার শরীর—সমগ্রতা
খোলো, ও মোহ আবরণ.......

সব ছুঁড়ে, ফেলে দাও

চুরমার হোক, এ পৃথিবীর বাস্তবতা
মেলুক পাখির মতো ডানা
তবু আমি, তোমায় ছাড়বো না
যতোক্ষণ না—
তোমার চোখে নিদ্রা হবে টানা ···

যতোক্ষণ না
তোমার মুখ—সিঁদুর রঙে রাঙা ···।

সময়কে বলি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সময়কে বলি : সময় ! তুমি, ওই পথে যাও
ওইখানে স্থির হ'য়ে বস
যেমন বসে দুঃখ যেমন দেহের পাশে ছায়া যেমন মরণ
আমি এখন এইখানে
এই পাথরে ফুল ফোটাব এই পাথরে মন্ত্র
এইখানে খোদাই করব নাম
শব্দে শব্দে দুলিয়ে দেব নাভিমূল
বাতাসে বাতাসে ভ্রূণবীজ
আমি পাহাড়ে আঘাত ক'রে খুলে দেব প্রস্রবণ
নীলিমার দিকে হাত তুলে স্পর্শ করব মাটিকে
চোখের মণিতে সূর্য জ্বেলে জ্বালিয়ে দেব
ঘরের প্রদীপ
তোমাকে বলি
তোমার হাতেই গচ্ছিত আমার সার ও সত্তার সান্ত্বনা
তুমি ওই পথে যাও ওইখানে স্থির হয়ে বস

বৃষ্টি হবে না

মানিক চক্রবর্তী

সিগারেটের শেষ ধোঁয়া পুড়ে-পুড়ে আসে আমাদের দিকে।
বাইরে বাতাস নেই। গাছের পাতা নড়ছে না একটাও।
তুমি ভাবছ, এই পড়ন্ত বিকেলবেলায় বাড়ির সামনে ঘাসে বসে
আমি এসব কথা বলছি কি করে!
সন্ধ্যেই হয়নি এখনো—এ সময় আমি কি বাড়িতে থাকি?
পশ্চিমবাংলা থেকে একটু দূরে, আরেকটা জায়গায় কিছুদিনের জন্যে চলে গেলে
মানুষ কেন দেখতে পায় না, বাড়িতে কি হচ্ছে-না হচ্ছে?
তোমাকেই বা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন!
দেখতে পাচ্ছি না তোমার সেলাই করতে-করতে পায়ের পাতাটা একটু চুলকে নেয়া-
দেখতে পাচ্ছি না ঘামে মাখামাখি কপালের লাল টিপ,
তোমার বিখ্যাত ভ্রুকুটি!
কি করছ বিহারের এই পাহাড়ঘেরা নির্জন, খোলামেলা এবং ধুলোওড়া জায়গায়?
বারান্দার সাদা চেয়ারে বসে-বসে দোতলা থেকে শুনছ ধূসর গাছের কথাবার্তা,
রোগা-রোগা টিয়া পাখিদের খুনসুটি?
কি করছ?
গা ধুতে যাবে এখন ছড়ানো-ছেটানো পশ্চিমের বাথরুমটায়?
ব্রাশে লাগাবে কলগেট? কমোডে বসবে দুদিকে পা ছড়িয়ে?
আরে ভাই—
এ বয়সে কাকে আর তোমার কথা মুখ ফুটে বলা যায়!
তবু সিগারেটের শেষ ধোঁয়া পুড়ে-পুড়ে এই যে আসছে আমাদের দিকে—
আমি কিছু বুঝতে পারি না—
অলসভাবে এটা কি ধরণের বিমর্ষ চেয়ে থাকা? কি ধরনের অপেক্ষা?
তুমি কিছু দেখছ না, আমিও কিছু দেখছি না তোমার—
তবে আবার কি!
আকাশে তাকিয়ে দেখ মেঘ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। আজ আর বৃষ্টি হবে না।

দুপুর

সুব্রত চক্রবর্তী

তখন দুপুর ছিল, ভাল্‌বাসা ছিল না
কোথাও।
মর্মের ভিতরে অগ্নিকণা উড়েছিল অশ্বখুরে,
মর্মের ভিতরে তীব্র চেরাস্বরে ডেকেছিল
কাক—
তখন দুপুরবেলা—ভালবাসা ছিল না
দুপুরে।

নিঝ্‌ঝুম দুপুর ছিল, মেঘচ্ছায়া ছিল না
কোথাও
স্মৃতির নিয়মে কোনো অভিমান করেনি
আখুটি,
স্বপ্নের নিয়মে কোনো সুখসাধ ছিল না
তখন—
শুধু চুল জ্বলেছিল, পুড়ে গিয়েছিল চোখ
দুটি।

ভালবাসাহীনতায় ভরে ছিল নিঃসঙ্গ দুপুর ...
কীটের গুঞ্জন শব্দে ভ'রে ছিল দৃষ্টরজা
বেলা ;
বিশাল, অস্পৃষ্ট দুঃখে ভ'রে ছিল
নিতান্ত-শরীর—
শরীরের স্তব্ধতায় চলে যায় মন্থর কাফেলা

কী এক গভীর টানে! ... ভালবাসা ছিল কি
কোথাও! যেন মর্মদেশে কেউ রেখে গেছে চুলের
আঘ্রাণ,
যেন মর্মদেশে কেউ রেখে গেছে অভিজাত
চোখ
দুপুরের মতো খাঁ খাঁ, দুপুরের মতো
দীপমান।

রাজেন্দ্রানী

শান্তনু দাস

দু'চোখ ভরে দেখার মতো চোখ ছিল না,
দু' কান জুড়ে শোনার মতো শোক ছিল না,
তবু আমি দেখে এলুম
হৃদয় মাপে মেপে এলুম
তুমি আমার ভাঙা দাওয়ায় স্বর্ণচাঁপা রাজেন্দ্রানী।

স্টেশনে আর টাইম টেবিলে ট্রেন ছিল না,
নিয়ে যাবার মতোন কোনো প্রেম ছিল না,
জীবন যখন মর্চেপড়া রেলের গাড়ি,
কর্ড লাইনে খাড়াই হয়ে এক আনাড়ি,
সমস্ত রাত সিগন্যাল আর ডাউন দিল না।

তেমন কিছু শোক ছিল না,
দু'চোখ ভ'রে দেখার মতো চোখ ছিল না,
তবু আমি দেখে এলুম,
হৃদয় তাপে মেপে এলুম,
তুমি আমার ভাঙা দাওয়ায় স্বর্ণচাঁপা রাজেন্দ্রানী।।

কোথায় বাড়ি

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

দু একদিন সমস্ত যোগাযোগই ভালোভাবে হয়ে যায়
লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল এসে থামতে না থামতেই
তুমি এসে পড়লে প্ল্যাটফর্মে—
গ্রামের স্টেশনে দুজনে দুজনকে না চেনার ভান করলাম
শিয়ালদাও এসে পড়ল ঠিক সময়ে—
তারপর পূরবী কাফে আর আমাদের কেবিন।

রেলের টিকিট, দুটো মোগলাই পরোটা ও দু কাপ
চায়ের পয়সা বাঁচাতে বাঁচাতেই মাস ফুরিয়ে যায়
সিনেমার পয়সা যোগাড় করতেও লাগে এক মাস
এই দু মাসে তুমি আরও রোগা হয়ে যাও,
চায়ের কাপ হাতে নেবার সময় স্পষ্ট দেখলাম
তোমার হাত কাঁপছে,
ট্রেনের হাওয়ায় চুল উশকোখুশকো
তোমাকে কী বলব এরপর ?
নিমফুল ফুটেছে গ্রামের পথে
মাঠের পর মাঠ কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চৈত্রের হাওয়া—
কিন্তু কোথায় আমাদের বাড়ি ? শহরে না গ্রামে ?
বিশাল বিরাট দিগন্তের মাঝখানে ধুলোয় শুয়ে
যে প্রেম আমরা করতে পারতাম
তা কেন আমাদের টেনে এনেছে এতদূরে ?
পঞ্চাশ মাইল ট্রেনে চেপে এলাম শুধু বিষণ্ণ হবার জন্যে ?
তোমার হাত কাঁপছে, তোমার চুল উশকোখুশকো
আর আমি জানি না,
আকাশের নিচে আছি না আকাশের মধ্যেই !

খরা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

মাত্র পাঁচদিন তুমি দূরে আছো, এত বড় খরা
পৃথিবীতে হয়নি কখনো, অথচ সেদিনও ছিল
এক হাজার বর্গ কিলোমিটারের গোলাপ বাগান
পদ্মিনী রাণীর পায়ে আলতো তুমি হেঁটে গিয়েছিলে।
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় ঘোষণা দিলেন
পরমাণু শক্তি দিয়ে মরুভূমি সবুজ করবেন
এসব প্রতীতি আজ বড় বেশী ভ্রান্ত মনে হয়
মাত্র পাঁচ দিন তুমি দূরে আছো, পৃথিবীতে খরা।

সমস্ত শরীর আমি ধুয়ে মুছে মন্দিরের মত
পবিত্র করেছি, তবু অপেক্ষার মেঘ জমে জমে
বৃষ্টি কি হবে না ? ফুল বুঝি ফুটে উঠবে অন্য গ্রহে ?
হৃষীকেশ এর চেয়ে বেশী কেউ সাধনায় আছে ?
লক্ষ্মীও দরিদ্র হন, সরস্বতী অধিক বিনয়ী
তবে কেন দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক ছড়ালে পাঁচদিন !

সঠিক ঠিকানা খুঁজে

যোগব্রত চক্রবর্তী

এই তো সময় ছিল
আজ কিংবা আরও আগে হলে
মানুষের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেত
কোনটা সঠিক বা কোনটা কতটা বেমানান।

মানুষের অধিকার বোধ
সম্পন্ন শরীর ঘিরে ভালবাসা
গেরোস্থালী এলোমেলো একাধারে স্বয়ং
লোপাট
তবু মাঝরাতে যখন প্রত্যাশী মানুষী যাকে
চায়
অনায়াসে পায় কি কখনও—

তুমি তো উজ্জ্বল রৌদ্রে একা একা হেঁটে
যাচ্ছ
উদ্ধত গ্রীবার কাছে থমকে যাচ্ছে শীতের
বাতাস
পাশে পাশে দৌড়ে যাচ্ছে ভিখারী বালক
প্রাত্যহিক দৃশ্যপট মুছে যাচ্ছে ক্রমশ
চৌদিকে
অভিমান ভুলে গিয়ে কেউ কেউ
টেলিফোনে
বলে যাচ্ছে সুদীর্ঘ সংলাপ—

একান্ত মানুষ পারে মানুষের সম্পর্ক সাজাতে
গভীর রক্তের ডাক উপেক্ষার সাধ্য আছে
কার ?

এই তো পেতেছি হাত

মৃণাল বসুচৌধুরী

এই তো পেতেছি হাত
দাও কতটুকু দিতে পারো দেখি
ঝাঁপির ওপরে কেন কাঁপছে আঙুল
কেন ঠোঁটে শব্দহীন ভাষা
পবিত্র নখের ম্লান
নিয়ন্ত্রণে
কেন স্তব্ধ শরীর মূর্ছনা
তবে কি বিষণ্ণ শীত
রোমকূপ থেকে শুষে নেয় সমস্ত উষ্ণতা
নাকি বসন্তের প্রবল উত্তাপ
সুখ ও শান্তির উৎসে
ডাকে সন্তর্পণে

কেন চোখে
প্রবাসী হাওয়ার স্মৃতি
শৌখিন বিভ্রমে কেন
অনুদার দুর্বিনীত হাত

আমি তো নেবারই জন্য
নতজানু
দাও
কতটুকু দিতে পারো দেখি

চোখ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

কি ছিলো তোমার চোখে, ফেরাতে পারিনি চোখ বহুদিন।
যেন দিগন্তের দিকে, মাথার ওপর দিয়ে
কোন স্থির অচঞ্চল জলস্রোতে
তাকিয়ে রয়েছো, মনে হ'তো।
স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিলো সেইদিন। শেষে এলো
সেই প্রতীক্ষিত রাত—
দরজা বন্ধ, জানলা বন্ধ, ঘন চোখে তোমার চোখের দিকে এগিয়ে যেতেই
তুমি দুই ঝটকায় বের করে আমাকে দেখালে হাতে তুলে
ভয়ংকর পাথরের চোখ।
আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠতেই আমার চোখের কাছে এসে
উপড়ে দেখালে আরো দুটি পাথরের চোখ। তবে
কি দেখেছিলাম আমরা? একথা ভাবতে ভাবতে ভোর হ'লো।
আজো আছি পাশাপাশি; আমাদের কোনকিছু দেখতে হয়না বলে
তোমার চোখের দিকে
চেয়ে থাকি একটানা, বুঝি, এইভাবে অগণন মানুষ
তাদের মানুষীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে শান্ত হ'য়ে,
শান্ত হ'য়ে হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ফের মানুষীর বুকে।

চোখ

শামশের আনোয়ার

আমি জারিনার চোখের সাপ দুটোকে ভালোবাসি
নাজনীনের চোখেরও
ওরা দুজনেই আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে সাপদুটো
যখন বৃষ্টি হয় খুব জারিনা ঘুমিয়ে পড়ে
বৃষ্টি ওর পাশ থেকে নিঃশব্দে উঠে যায়
জারিনা কি টের পায়
পেতেও পারে
সাপেরা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে
নাজনীনের পাশ থেকে বৃষ্টি উবে গেলে
নাজনীনও বোঝে
আমি নাজনীন ও জারিনার চোখের দু জোড়া
সাপকে বৃষ্টিতে ধোয়াই, ভালোবাসি
খেলা করি

গীতিকবিতার পাশে

কালীকৃষ্ণ গুহ

গীতিকবিতার পাশে একা একা শুয়ে থাকি—
গীতিকবিতার পাশে একা একা জেগে উঠে দেখি,
তোমার দু'চোখে জল।
এতো শান্ত চোখে জল? এই দৃশ্য দেখে ভীষণ
চমকে উঠি আমি।

আমাদের প্রেম, জানি, ব্যবহৃত হয়ে গেছে আজ
আমাদের কবিতার ভাষা ব্যবহৃত হ'য়ে গেছে
আমাদের বধিরতা, অন্ধত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা, ব্যবহৃত হ'য়ে গেছে।
তবে তোমার দু'চোখে কেন জল, অঞ্জু? নাকি এ নির্ভুল
দৃশ্য নয়?

এই মধ্যরাত্রে আমি মানবিকভাবে এই মাথা রাখি নীল বিছানায়। পাশে
জল, মৃত্যুবোধ, ঘড়ি··

গোপন বিবাহ

রমা ঘোষ

চাবুকের দাগ দেখে যেই তুমি ঠেকালে আঙুল,
কঠিন পাহাড় দেশে বাজলো মাদল,
পূর্ণগ্রাস থেকে চাঁদ মুখ তুলে তাকালো নরম,
তার কোনো ক্ষোভ নেই। বুনো গাঁদা ফুল
পার হয়ে বসেছো গভীর হয়ে মাটির উঠোনে পাতা
কাঠির মাদুরে।

মোটা ভাত, লাল শাক, দিলাম আমার অন্ন দুঃখের হাঁড়ির,
আহার পার্বণ হলো কি ভাবে যে তুমিই তা জানো!
কাকে বলি, কাছে-পিঠে কেউ নেই, রাত্তিরকে ডেকে
বললাম, জানো নিশা, ও আমাকে দিয়েছে সিঁদুর।

পা দু'খানি বাড়িয়ে আছে

ধূর্জটি চন্দ

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে একলা ঘরে বয়স্ক রাত
আস্তে আস্তে একাগ্র মন তোমার কাছে যেতে থাকে
এই যে যাওয়া— এরও একটা অল্পস্বল্প মানে আছে,
মানেটা কি ? সেটাই যদি আগে বলি গল্প হয় না।
তার চেয়ে বরং ভালো এমন একটা জায়গা জমিন
যেখানে সব সর্বনেশে অহংকারী কান্ড আছে,
আছে দুঃখ নিমের মতো বৈপরীত্যে মিষ্টি ফলে
জঙ্গলে ঐ যেমন থাকে শান্তশিষ্ট তপস্বিনী।
যদি ভাবো এর মানে তো সেই পুরাতন গন্ধ চুরি—
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দ্যাখা এ বয়সে সবারই হয়,
সংগোপনে তবে বলি কস্তূরী লো ও কস্তূরী
জীবনটাতো ঐ মূলেতেই আত্মীয়তায় জড়িয়ে আছে।

আসল কথা চিরকালীন শ্মশান আছে নদীর কাছে
তাই নদীতে একাগ্র মন পা দু' খানি বাড়িয়ে আছে।

শান্তিহীন ঃ একটি

ভাস্কর চক্রবর্তী

বিরক্তিভরা দিনগুলো আমি আজ উপহার পাঠাচ্ছি তোমাকে।
দুঃস্বপ্নের শতসহস্র রাত
আমার ভাঙা চশমাগুলো—রাত্রিবেলায় জলে-ভেজা ভৌতিক ঘড়ির শব্দ—
সমস্ত কিছুই, ফুলের তোড়ার মতো,
আমি আজ তুলে দিতে চাইছি তোমার হাতে।
আমি দশ-পয়সা ফেলে দিয়েছি যন্ত্রে আর জেনে নিয়েছি আমার ভাগ্য—
আমি সারারাত দরজা থেকে দরজায় বিছানা খুঁজে ফিরেছি—
স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমার হাত ছুটে চলেছে তোমার মুখের দিকে
স্বপ্নে দেখেছিলাম, গানে-গানে ঢেকে গ্যাছে আমার সারা শরীর—
আজকাল শুধুই সাদা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে আমার
আজকাল সারাদিনই ডাক-পিওনের পেছন-পেছন আমি ঘুরছি
—আমার চিঠি কোথায় ?

গভীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন আমি জিগ্যেস করি— 'তুমি কে' ?
সারাজীবন আমার কোনো কাজ ছিলো না
কোথাও কোনোদিন হাতছানি ছিলো না কোনো।
আমি টেবিল থেকে শুধুই মানুষের ফেলে যাওয়া দেশলাই জড়ো করেছি
গঙ্গার মাটি দিয়ে সারিয়েছি উনুন
লিফটে চেপে, আমি দুঃখ-কে নিয়ে সটান ঢুকে পড়েছি দশতলার ফ্ল্যাটে।
—এটা কি সত্যি যে আমি মরতে চাই
এটা কি সত্যি যে আমি মরতেই চাই
বেঁচে-থাকার জন্যে, তুমি বলো, আমি কি পাশ ফিরে শুইনি বিছানায় ?

চুম্বনের সময়ে

দেবারতি মিত্র

তোমার বিহ্বল মুখ চুম্বনের সময়ে তো আমি
কিরকম দেখিনি কখনো
যখন একটু দূরে কোণাকুণি বেঁধে লাল আলো
তখনও বুঝিনি ঠিক দু চোখের পল্লবে জোরালো
কি যে তুমি লুকিয়ে রেখেছো।
আমাকে কোথায় ডেকে ডেকে নিয়ে গেছো।
দৃশ্যাদৃশ্যান্তর শুধু তোমার শরীর
আমি তো বুঝি না ভালো ওই রক্ত কেমন গভীর
ছটফটে শরীরটি কার অনুগামী
তবু আমি দুঃসাহসে একলা এগিয়ে কাছে যাই।
হঠাৎ গ্রীবায় দীর্ঘ সাতটা চুম্বন পর পর
ফিসফিস করে কাঁদে অর্থহীন কথা
তুমি ভারি কৌতূহলী কে তোমাকে অনুযোগ করে ?
আমাকে জড়িয়ে ধরে বৃষ্টি বৃষ্টি সমস্ত সকাল,
চুম্বক গতিতে মেশে তোমার সবুজ আর লাল
চিবুকে ছোট্ট ঐ এক ফোঁটা তীক্ষ্ণ ঘাম
চমকে চমকে ওঠে কতদূরে ডেকে নিয়ে যায়,
ছটফটে শরীরটি গভীর অন্তরে বাধা পায়।

শ্মশান বন্ধু

কমল চক্রবর্তী

তুমি বললে, শ্মশান বন্ধু কোথায়?
আমি দু'উরু জড়িয়ে কাঁদলুম সারারাত।
তোমাকে বললুম, ঐ দেখ চিতা
তুমি জানালা দিয়ে দূরে একটা জলপাই বাগান খুঁজলে
আমি বললুম, এই দেখ, যোনির উষ্ণ হাঁ-এ মুখ নামিয়ে দিলুম
'এই দেখ মড়াপোড়া মাঠ, ধূ ধূ নীল,
তেরো ডাকাত, এই দেখ কলসীর কানা।'
তুমি বললে, তবে আগুন দেখাও, আগুন
আমি দুহাতে লকলকে স্তন মুঠো করে বললুম,
'এই দেখ পোড়া হাত'।
তুমি বললে, শেয়াল কোথায়?
আমি খোলা চুলে কোমর অব্দি ডুবিয়ে দিলুম।
এই যে খড়, এই যে ঝোরা, এই যে আকাশ, এই যে পাতক।

আমি জানি চিতার গভীরে শুয়ে আছ তুমি
আমি জানি আগুনের মধ্যে একা আঁধার
কত হিজল, মাদার, শেয়াল কাঁটা, পাণিপাঁড়ের ছোট ছোট স্টেশন
তক্তপোষের ওপরে চিতা জ্বালিয়ে শুয়ে আছ তুমি
মড়াকে টানছ।
আঁধারলীন হলে ভাসমান মড়াকে টানছ
আঁধার দুহাতে সরিয়ে চিতায় শুয়ে আছি সারারাত।
ছায়া পুড়ে যায়
বৃক্ষ পুড়ে যায়
চন্দন কাঠের গভীরে অবিরল ঢুকে যায় মরা মানুষের ভিৎ
চিতা মুঠো করে তোমাকে তাতিয়ে তুলেছি
তোমার কামনা
তোমার শেষ রাতের বিষাদ
তোমার শ্মশান বন্ধুর অনন্ত পদযাত্রা

প্রেম

অজয় নাগ

এই স্পর্শহীন হাওয়ায় আমাকে ভরায় আমার ইহলোক
আমি একদিন চলে যাব গভীরে তার
আমাকে ডেকেছিল বহু জন্মের সোপান পেরিয়ে

আমার দেরি হয়ে যায়
সংসার ছায়ার তলে ঘুমে জাগরণে

এইখানে কী আছে কিসের বেদনা কার
রক্তে রক্তে গোলাপ ফোটাবে

নিষ্ঠুর সুন্দর হাসির আঁধারে
সে আছে স্থির সর্বনাশী আসন মেলে—

কে সে
আমি কি জানি তার প্রবল পরিচয় আমার ভিতরে

গতরাত্রে স্বপ্ন

সুব্রত রুদ্র

গতরাত্রে স্বপ্নে তোমার পিঠের ছাল তুলে দিয়েছি
ঘুমের মধ্যে হঠাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে
আমি মিথ্যে স্বপ্ন দেখলেও তোমার
মুক্তি নেই, স্বপ্নে আমায় কেন কষ্ট দিয়েছিলে ?
পাগলা কুকুরের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা
জলাতঙ্কের মতো ভালোবাসা
রাস্তার ধারে আগুন জেলে যে পাগল তার চুল পোড়াচ্ছিলো
আমি তার কাছ থেকে ভালোবাসা শিখেছি।
সভ্যতা জ্বলে যাওয়া ভালোবাসা
কেবল চোখে আগুন, মুখে আগুন, বুকে আগুন
কেউ কোথাও নেই, খাওয়া দাওয়া বন্ধ,
স্রেফ স্বপ্নে রাতভোর ...

স্বপ্নে আমায় কেন কষ্ট দিয়েছিলে ?

শুশ্রূষা-আদল

কৃষ্ণা বসু

মনে রেখো একসঙ্গে আমরা গিয়েছি ওই রেডরোড ধরে
আমাদের সঙ্গে থেকেছে সরাই-খানার গল্প,
ক্রিসমাস আর শীতের রোদ্দুর ; তখন তো
শীতের দুপুর ছিল চারিপাশে
এবং রঙিন কার্ডিগানে ছিল কুসুম-প্রস্তাব,
মহিলার আশ্চর্য যাদুতে যেমন
রঙিন উলের বল তৈরি করে মায়াবী জাম্পার,
সেরকম আমাদের কথা থেকে কথা থেকে
তৈরি হতে থাকে লালচে সোনালী মধু সুন্দরবনের,
ঈষৎ তিতকুটে স্বাদের ; নবীন জলের নদী
আর তার ঠাণ্ডা স্বচ্ছ শুশ্রূষা-আদল ....

কোথায় তুমি

অভিজিৎ ঘোষ

কোথায় তুমি, বদ্ধ দুয়ার, দুয়ার খোলো
কোথায় আমার স্বপ্নগুলো ? পথের মধ্যে পথ হারালো ?
ভালোবাসার ঠিক ঠিকানা কোথায় পাবো বলতে পারো ?
কোথায় গেলে পাবো ফিরে হারানো সেই ঘরের চাবি ?
তোমার আদেশ মানবো আমি   কথা দিচ্ছি
কোথায় তুমি ?   বদ্ধ দুয়ার, দুয়ার খোলা

আজকে রাতে শিশির ভেজা শীতের রাতে
তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার উত্তেজনা
ভালো লাগছে মনে মনে
আমায় তুমি ভুল বুঝোনা, লক্ষ্মী সোনা, ফিরে এসো
এ বসন্তে কোথায় তুমি ? বদ্ধ দুয়ার, দুয়ার খোলো

তোমার জন্যেই লেখা

তুষার চৌধুরী

এই তুচ্ছ কবিতাটি তোমার জন্যেই লেখা, অথচ তোমাকে
কি করে জানাই, এই চন্দ্রমল্লিকার মত বহুবর্ণ ক্ষত
যদি ফেরাও তোমার মুখ, ভয় পাও নিজেকেই দেখে
এই প্রসাধনী পারা, মায়ার দর্পণ, একে কিরকমভাবে নেবে তুমি

তুলোর শয্যায় কাঁকড়া, উপদ্রুত রতিঘুম, বাতাসে ফোকর
ইচ্ছে ছিল মীরামারে নীল জলোচ্ছ্বাসে
জালাজালা হলাহল, মৃত্যুর বিধর্মী প্রেম, সুন্দরী তোমার শঙ্খমেদ
কামুক দেবতা যেই আক্রোশে মন্থন করে রম্ভার শরীর
চেটে খায় অগ্নি জল লাভা
ইচ্ছে ছিল

আজ দেখি উন্মাদের চেতাবনী উড়ে যায় ভোরের বাতাসে
এখানে মানুষ মরে মলমাছিময় বুড়ি সকালের রোদে
সূর্যাস্তে হোঁচট খায় জন্মান্ধ কেরানি প্রতিদিন
ঘুরে ঘুরে ঘুঙুরের চাড় ফেলে জ্যোৎস্নায় শিকার খোঁজে গাভিন কুমারী
এর ঘামতেল্ল মুখ ওর রক্তপ্রবালের ঠোঁট
ছন্নছাড়া কবি তুলে ধরে

এই তুচ্ছ কবিতাটি তোমার জন্যেই, এই সামান্য রচনা
তোমার দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'তে চেয়ে বারবার
শামুক জেলির গন্ধে বেসামাল এজমালি বালিতে ঘুমোয়

বাকলে নখের দাগ, নগ্ন পুঁজ, ফচকে ছোবলের উপশম
মৃত মোম, স্বপ্নে তিন হিংস্র নারী বগেরির মাংসভোজ সেরে
নিদ্রা যায়, সকালের রঙিন মড়কে ওরা জেগে ওঠে ফের
মুঠোয় খরার বীজ, ছড়াবে ফাটলে, জাগো অলস গণিকা
মৃত্যুর গোলাপ তুমি, ভোরের সুগন্ধি বমি, জমাট রক্তের পোঁচড়া দাগ

কবুলতি

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

মিনারের ওপারে চাঁদ খুন-কাদা-পানি-পসিনা
মেখে এলো দোজখ থেকে সফেদের কমেছে তেজ ;
আজানের পরের ফাঁকা। তা-ও, এখানেই বসি না ;
যদিও বাতাস খামোশ, তবু চাঁদ, খুদা হাফেজ....

বেশরম, আর কতোবার মেঘে-মেঘে চাও দিতে ডুব ?
আজ আমি জায়নামাজে নিজেকে জেনেছি খুব—
মুবারক জানিয়েছিলাম একদিন, সব-কিছুকে ....
তশলিম-ও রাখলো সবাই এ-মনে সেই সুযোগে ;
আল্লাহ্ সিন্ধুবিষাদ, তাঁর তরঙ্গকৃপায়
ভিতরে ঢুকলো এজিদ, অশ্বারোহী হানিফা ....

ভিতরে উঠলো পাঁচিল। জবানের খানিক মোহর
সেই থেকে, হয়েই আছে। সব-একা-থাকার-প্রহর
ঘোড়াটার শব্দ শুনি। রাখলাম এ দস্তাবেজ।
সবই বরবাদির খবর, তবু চাঁদ, খুদা হাফেজ,
আজ রোখ্ অন্যরকম, আরো চাই মেহেরবানি,
চাঁদ, তুমি জড়িয়ে থেকো সব কাদা-পাথর পানি ....

প্ররোচনা
রণজিৎ দাশ

তুমুল বৃষ্টির রাতে মনে হয় বাতাসতাড়িত
তোমার শরীর জুড়ে আমিও মেঘের মতো ভেঙ্গে পড়ি, মুষলধারায়
তোমাকে ডুবিয়ে রাখি বুকজলে, ব্যাঘের নিঃশ্বাসে
ঝড়ের দাপটে যেন শিকারী তাঁবুর মতো ফুলে ওঠে স্তন
যেন তুমি বলে ওঠো, 'আর নয়, আর নয়, জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়'
তারপর থেমে যাই, গোপন জানলা থেকে শেষবিন্দু জল ঝরে, পাশে
ছিন্ন টেলিগ্রাফ-খুঁটি পড়ে থাকে ঘন ধানক্ষেতে
সমস্ত বিছানা জুড়ে মেঘাচ্ছন্ন চুল, হাওয়া, চকিত বিদ্যুৎ,
নিষ্ঠুর বিরতি—যেন ওলটানো লরি-র পাশে শুয়ে আছে জাতীয় সড়ক
'আবার কি বৃষ্টি হবে, আরো ঝড় ?' তুমি চাপা, উদগ্রীব গলায়
আমাকে জিজ্ঞেস করো, কথা শুনে আকাশ স্তম্ভিত
'অবশ্যই'—আমি বলি, সম্মোহিত লরির চালক

চতুর্দশপদী

সৈয়দ কওসর জামাল

জলের উত্তাল ঢেউ ভাঙছে নদীর খোলা গায়েঃ
শুরুতেই এমন লাইন বুঝি ভুল হয়ে গেল
এ দৃশ্যকল্পের আড়ালে আছে যে সে তো নদী নয়
ঋতুও কখন শরৎ হয়েছে ধীর নদীজলে

বলেছি যখন, ওগো প্রকৃতি দেবতা, মেনে নাও
নারীটিকে দ্যাখো—জলোচ্ছ্বাস নয়, শরৎ নিসর্গ
আহ্লাদিত হয়ে বসে আছে জলজ অভ্রের নীচে
জেনেছি সম্পূর্ণ হবে তার ভালোবাসা এই শীতে

তার জন্যে আমি এনেছি পাহাড় থেকে স্রোতস্বিনী
আমি জলসিঞ্চন করেছি রুক্ষ মৃত্তিকার দেহে
আমি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি শস্যবীজ
আমি ভরিয়ে দিয়েছি এই ভূমি সবুজে পল্লবে

চেয়েছিল নারী, আমি তার প্রেমে সম্মতি দিয়েছি
ফসলের ঘ্রাণ নিতে আকাশ এসেছে নীচে নেমে।

তৈজসেরও দেখা পাইনি

নিশীথ ভড়

সুতোয় গাঁথা প্রণয়লিপি ওড়ে আমার হৃদয় জুড়ে
ওখানে তোর নূপুর বাজা, আধেক ভাঙা ধ্বনির চিহ্নে
যা আছে তা সব মুছে যায়, স্তনে করাঙ্গুলির·মতো
এ অনন্ত চিত্রশালা ঝাঁপ দিয়েছে মদের পাত্রে।

ও মদ, জ্বলো, শিখার সূত্রে, সুড়ঙ্গপথ ওই গভীরে
প্রাচীন লিপির মতো জ্বলো,·জরাগ্রস্ত, অভিশপ্ত—
জ্বলো হাওয়ায় অন্ধকারে, ব্যাকুলতার রন্ধ্রটি শ্যাম
পেয়েছে, বাঁশি বাজায়, নূপুর কি আরো ক্রূর হবে রাধার—

এমনভাবে খেলতে-খেলতে খেলনা কত টুক্‌রো হলো
জন্ম তোকে মনে পড়ে না, ভ্রমণে কত মুখচ্ছবির
ময়লা জমে উঠল বুকে, এ গহ্বরে কে দেবে পা—
লেলিহ লোল জ্বলো তরল, তরলতার সরল অঙ্গে।

সুতোই যদি ছিঁড়ে পড়বে বর্ণমালা দুলবে না আর
ভ্রূকুটি কার কঠিন হয়ে উঠবে মন্থনের পরে—
যাবো কোথায় ? নিরুদ্দেশও বাধা গড়ল আপন হাতে
এ জন্ম বাম, প্রিয় কোনো তৈজসেরও দেখা পাইনি।

স্বাভাবিক

বাপী সমাদ্দার

মাথায় টায়রা, বিছে বাজু, যেন এক কাটা পরী
দীপগাছা হাতে নিয়ে ওসীয়ৎ করল : আমি রাজী।
ছেলেটি ভালোই, জগঝম্প কোর্তা, এড়িতোলা জুতো :
একমাথা চুলের ছোবড়া নিয়ে বল্ল : সাক্ষী : আকাশপতঙ্গবন

হঠাৎ ব্রাহ্মণী চিল, ধরো, ছবির শত্রুঘ্ন, ছোঁ মেরে হাজির,
হাতে রাগের রুমাল বাঁধা যেন এক তেজস্বী পিস্তল
তুমি আমার তাজমহল, বিবি—
অগ্নি-তালগোল চাঁদ, রক্তের পুকুর

অথচ আকাশে কিন্তু পাখি ডেকে যাচ্ছে
কুয়োত রো কুয়োত রো হুট্টিটিরি হুট্টিটিরি

তোমাকে

অরণি বসু

ঘনান্ধকারেও আমি তাকিয়ে ছিলুম তোমার দিকে,
তুমি লক্ষ্য করনি।

কে কবিতা পড়ছিলো তখন ?
কবিদের ঘরোয়া সভায় হঠাৎ ঝুপ্ ক'রে নেমে এসেছিলো লোড্-শেডিং।
তখনই ফস্ করে দেশলাই জ্বেলেছিলো কেউ কেউ,
অন্ধকারের মধ্যে, গুঞ্জরণের মধ্যে
দেবার্চনার মত হাতে হাতে ঘু[illegible]লো সেই সব আলোকশিখা।
ম্লান আলোর ভিতর দিয়েও আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিলাম তোমার দিকে
তুমি লক্ষ্য করনি।

আমার জীবনের সমস্ত মেঘ আমি উড়িয়ে দিয়েছি
তোমার আকাশে,
আমার সামান্য জীবনের যৎসামান্য সঞ্চয়,
যতদূর সম্ভব অহংকার
তোমার পায়ের তলায় এনে জড় করেছি বারবার।
তুমি লক্ষ্য করনি,
তুমি লক্ষ্য করনি,

তুমি লক্ষ্যই করনি।

গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে

সমরেন্দ্র দাস

তুমি সুন্দর ব'লে কোনো সুযোগ নিইনি কোনোদিন
সমুদ্রের দেদার হাওয়ার পর ভাঁজ খুলেছিল—শাড়ি
রাঙা পা দেখেছি কলকাতা জলের তলায় শুয়ে পরলে
শান্তিনিকেতনের রাস্তায় কেউ ছিল না সেদিন দুপুরে

লতানে পাতার মোড়কে কে জেগেছে শক্ত পাথর!

ভালো না বাসার অধিকার তিনবছর নয়, এখনও আছে
গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে তা তুমি ছুঁড়ে ফেললে আজ দূরে ···
শেষকথা
শেষ কথার পরও কথা থাকে ভিতরে, গহ্বরে
চোখের পাতায় যেমন লেগে থাকে কৌতুক ও কৌতূহল
হাতের ছোঁওয়া থেকে দূরে গেলেই কি আর দূরত্ব জাগে!
পুজোর পর যেমন অঞ্জলির ফুল ও পাতা, সন্ধিপুজোর গন্ধ

কত কিছুরইতো বিকল্প আছে, মানুষের, প্রিয় নারীটির?

হলুদ শাড়ি, চুলের ভাঁজ আর গ্রীবার সটান ভঙ্গিমা!

অন্য মানুষ

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

সে আমার বন্ধু ছিলো অনেকেই জানে
জানে রোদ জানে হাওয়া স্বর্গের হিসাব-রক্ষক
জেনেও জানি না শুধু আমি।
ওসমান মালিকে ফাঁকি দিয়ে আমবাগানে ঘোরাঘুরি
পাতার খুশির গন্ধ কাঠবিড়ালীর ইতস্ততঃ লুকোচুরি খেলা
জোয়ারে গঙ্গার ঢেউয়ে 'সুভাষ সুভাষ' সেই আতঙ্কিত ডাক
অনেকেই ভুলে গেছে আমি তবু নির্বাক নিথর।

কলকাতা আমাকে খায়
ধান্দার হাটে রিডাকসনে বিক্রী হই রোজ
চোরের হাতে চুমু খেয়ে প্রকাশ্যে তাকে সম্রাট বলি।
এই রকম এক একটা যুদ্ধ এক একটা রানার্স-কাপ।
তামার ফুটো পয়সা মুখে দিয়ে অনিমেষ ও আমার ছায়া অন্বেষণ শেষ হয়নি
গ্রীষ্মের দুপুরে ওর মায়ের শীতল আঙুল আর 'সোনামণি' ডাক,
ভুল হয়ে গেল।
অনিমেষ এখন বাজারে তেলেভাজা বিক্রি করে
গলির মোড়ে ওর অন্ধ মায়ের হাতে ফ্যারেক্স-এর পুরণো কৌটো।

মোটামুটি পলিশ্‌ড পোষাক
হিপ্‌-পকেটে মিডিয়াম-ক্যালিবারের চিহ্ন দু' একটা ছাপ মারা কাগজ
রোববারে মাংস, কমদামের পাউডার ঘষে ইভ্‌নিং-শো-এর সিনেমা
মনে পড়ে, স্বর্গের সিঁড়িতে বসে আমি ও অনিমেষ
এইরকম জীবনের কথা আদৌ ভাবি নি।
'বেঁচে থাকো, বড়ো হও'—অনিমেষের মায়ের সেই পবিত্র আশীর্বাদ
মনে পড়লে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে জামার ডগ্‌-কলারে চোখ মুছি।
এ কেমন বেঁচে থাকা,এ কেমন বড়ো হওয়া
অনিমেষ বাজারে বিক্রি করে তেলেভাজা
গলির মোড়ে ওর অন্ধ মায়ের হাতে ফ্যারেক্স-এর পুরণো কৌটো,
রোজকার বাজারে আমার বিক্রী হয়ে যাওয়া ?

একদিন যে আমার বন্ধু ছিল
এখন সে অন্য এক মানুষ হয়েছে।

অভিমানে ভেঙে যায় সব

শঙ্কর চক্রবর্তী

মঞ্চে বসিয়েছো তাকে, কপাল-সিঁদুরে, প্রজাপতি
উড়ে যায়, পায়ে আলতা-কোথায় কেউতো স্পর্শ করে না কখনো?
ওহে দোলায়িত ফুল, পিপাসার শূন্যতায় ভালো নেই কেউ
ভালো নেই আমাদের নিজস্ব চুম্বনও;
        বাতাসে পা ভাসিয়েছো তুমি, সুগন্ধের
শাদা জ্যোৎস্না ভেঙে-পড়া পায়ের নিকটে ছিলো অভিমান, পরিত্রাণ কিভাবে সুদূর
হ'য়ে যায় দ্যাখো, জল ছোঁয়না মঞ্চের প্রিয় লাল ও সবুজ।

একদিন রহস্যের কৌটো থেকে তুলে নিলে ডানা-ভাঙা কীট
তাকে অতিথির মতো সাজাও চন্দনে, তার সে-শীর্ণ শরীর জুড়ে ছিলো ভালবাসা—
তুমি দয়া করো মেঘ, ওই সুন্দরীর মঞ্চ ভাসিয়ে প্রকৃত মাংস তুলে নিতে চাই।

আজ টুকটুকির বিয়ে

শ্যামলকান্তি দাশ

আইবুড়ো ভাত খেতে সেদিন টুকটুকি
আমাদের বাড়ি এসেছিল।
খাওয়াদাওয়ার পর এঁটো থালায় কড়ে আঙুল দিয়ে
টুকটুকি মানুষের মুখ আঁকছিলো।
মুখ আঁকতে আঁকতে নৌকো
নৌকো আঁকতে আঁকতে মাছ
মাছ আঁকতে আঁকতে পতঙ্গ
কিন্তু কোনো ছবিই তার ঠিকমতো পছন্দ হচ্ছিল না।
আসলে এইরকম অনেকগুলো অপছন্দের সঙ্গে
আজ টুকটুকির বিয়ে।

টুকটুকির বর লোক ভালো—
কাকে যমক বলে কাকে উৎপ্রেক্ষা
এসব জানতে তার বয়ে গেছে,
কিন্তু সে কবিতা লেখে অতি চমৎকার!
নদীর ঢেউ গুণতে গুণতে সে রাত্রি কাবার করে দেয়,
কিন্তু একটাও নদীর নাম জানে না!
তার কবিতায় এত ফুলের সুগন্ধ
কিন্তু সে চেনে না কোন্‌টা আকন্দ আর কোন্‌টা কেয়া!
আজ টুকটুকির বিয়ে,
ভাবছি তাকে শিকড়মাটিসুদ্ধু একটা আস্ত আকন্দফুলের ঝাড়
উপহার দেব!

টুকটুকিই বা মেয়ে হিসেবে কম কী!
কতবার যে সে আমার জন্য বেড়াল হয়েছে
আর কতবার যে খরখরে সাদা কাগজ,
তার কোনো হিসেব নেই—
মনে পড়ে সে শুধু জ্যোৎস্নার ভাষা বুঝত,
আমি তার হাত ধরে অন্ধকার চিনতে শিখিয়েছিলাম।

আজ টুকটুকির বিয়ে,
ভাবছি আমার সমস্ত শরীর আজ তাকে উপহার দেব।
সে হাত বাড়াবে কি না আমি জানি না!

হে লাবণ্য, হে ক্রোধ

অজয় সেন

হে লাবণ্য, প্রেম, হে ক্রোধ ওড়ো, উড়ে যাও দক্ষিণ দিকে, কর্কট ক্রান্তিতে
স্নায়ু মধ্যে ক'রো খেলা, রক্তময়তায়, প্রগাঢ় রহস্যে ভ্রূণ এঁকে দাও ত্বরান্বিতে
ক্ষীণ অবয়বে গড়ো বসতি, হে প্রেম দেবী—
ছিঁড়ে চুষে খাও হাড়, পরিবর্তে দাও মাংসাশী ক্ষুধা
অন্তহীন মাধুর্যে বশীভূত করো কাম-ক্রোধ,
রিপু উচাটন মন্ত্রে মারো আমাকে, আরো মারো শরীরী লাস্যে।
আমিষ রহস্য জানুক তন্বী যুবতী,
শরীর জ্বলুক কামদাবানলে, আশ্লিষ্ট মুগ্ধতায়
কণ্ঠনালী তৃষার্ত হোক দীর্ঘরাত্রিতে—
জিহ্বা থেকে ঝরুক তোমার প্রাচীন প্ররোচণা গান
অহোরাত্র ভেসে থাকো যেন অক্ষিগোলকে
লজ্জা সঙ্কোচের মাথা খেয়ে—
হে প্রেম, হে ক্রোধ জ্বলে ওঠো, জ্বলে উঠে প্রবেশ করুক
শরীরে তোমার।
সমুদ্র ফেনাগন্ধ, মৎস্য চতুরতায় ভরে উঠুক দক্ষিণ বাতাস
স্ফীত স্কন্ধী বীর্য হাওয়া লাগুক তোমার নাসারন্ধ্রে।
তুমি মাংসাশী দেবী
জ্বলো, জ্বলে উঠে হারাও নিজেকে রহস্যের প্রচ্ছন্ন গুহায়।

মৃত্যুঞ্জয়

নির্মল হালদার

আমার কাছে অনেকদিন ছিলে
কোনো রাগ ছিল না দুঃখ ছিল না
কেবল মাটির গন্ধ শুঁকে লাফিয়ে উঠতে
উড়ে যাওয়া পাতার পিছনে ছুটে গেলে একদিন
লুটিয়ে পড়লে কুসুম গাছটার নিচে

আমি অতদূর পৌঁছোতে পারি না

শুভ আগুন শুভ ছাই : তিন

জয় গোস্বামী

তিনজন বোন জেগে ওঠে একযোগে
তিনজন বোন স্নান করে একই ঝর্ণায়
তিনজন বোন উড়ে যায়, ছ'টি ডানা
জ্বলে ওঠে আর নিভে যায় নিশীথের
সব তারাগুলি আর তিনজন আকাশে
অবসর মত ছুঁড়ে দেয় হাতচিঠিও।

ওরা তিন বোন তিন রাত জেগে তৃতীয়
রাত্রির শেষ মুহূর্তে ক্রূর চোখে
আকাশে তাকাল, তারার গাছের শাখা সে
আঘাতে কাঁপতে, একটি যুবক—জোর নেই,
শরীরে কি মনে, খ'সে পড়ে গেল শূন্যের গোল শিশিতে…
'ওমা, দেখ্ দেখ্ কী বোকা কী বোকা ! চোখ নেই বুঝি, কানা ?

ওরা তিনজন ছুটে গেল, ছ'টি ডানা
ঝলসালো ফের আকাশে…' এই যে প্রীতি ও
শুভেচ্ছা নিন্। কি উষ্ণতায় কি শীতে
আমরা তিনটি এখানে থাকি, এই ঘোর দুর্যোগে
বেরিয়েছিলেন কী ব'লে ? আসুন, এই দিকে, ঘরকরনায়
আমাদের খুব মন নেই ; তবু, নিয়ে যাই গৃহসকাশে।'

আমারও ওসব গৃহ টৃহ নেই, তবুও গৃহের শখ আসে
কখনো কখনো'—ছেলেটি ভেবেছে, আর দূর থেকে কারা নাম
ধরে ডাক দিলো—'প্রিয়, প্রিয়তম, ওর না'য়
উঠো নাগো তুমি, রাঙা ও কুমারী সিঁথি মোর…'
তিনদিক থেকে ওঠে এই ডাক ব্রতচারী উদ্যোগে
'এদিকে তোমরা কোথায় হারালে মালবিকা, পৃথা, ঈশিতা !'

শূন্যতা। প্রায় শেষ হয়ে আসা নিশীথে
শূন্যতা শুধু জেগে আছে আর ছেলেটি, এমন বোকা সে,
বোকা তা হলেও সুন্দর, যেন গৌতম বুদ্ধকে
দেখছি, এখন চারদিকে কোনো সাড় নেই, কোন সাড়া না—
এরই মাঝখানে পাহাড়ীয়া লোকগীতিও
মাথা রেখে বেশ ঘুমিয়ে রয়েছে পাহাড়ের নিচে পর্ণে!

ওরা তিনজন, ওদের এখনো ঘর নেই
ওরা তিন বোন কখনো কখনো ঝিঁঝিতে
রূপান্তরিত হয়ে যায় আর মাঝে মাঝে হাতচিঠিও
ছুঁড়ে দেয়, যদি আবার একটি লোক আসে—
একদিন ওরা ছেলেটিকে পায়, বলে, 'এই দেহ কার আনা ?'
আমরা কি ? হায় আমরা মেরেছি সুন্দর মুগ্ধকে!'

শেষ পর্যন্ত ভালোবাসায়

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোৎস্নার ঢেউ ভেঙে ঘুম থেকে উঠে
ওই ডুবন্ত রমণী আজ ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।
শেষ রোদ্দুরে শেষ স্নান সমাপ্ত করে
বিপজ্জনক বিন্দুতে দুলছে ওর দুটি পা

উত্তর তিরিশ ওই মোহিনীর বুকে কোন আঁচল নেই
অদৃশ্য লজ্জার কারুকাজে বোনা জন্মাবধি পাওয়া
একখানি বালুচরী শাড়িতে সে ঢেকেছে শরীর
বাতাসের ধার কাটা অলঙ্কারে সর্বস্ব উজাড়
চুল থেকে ক্রমাগত ঝরে পড়ে নীরব মাধুর্য।

শমিত কার্নিশে এসে ওর উদ্যত পা-দুখানি নির্বাক
খুব অবহেলা ভরে দর্পিত নয়নে
সে ওই সূর্যকে দেখে একবার,
সমাপ্ত রোদ্দুরের ঝাঁঝ গভীর চুম্বনের মতো
ওর রূপে রঙে রেখায় জ্বলে উঠতেই
সে মুখ ফিরিয়ে নিজের দিকে তাকায়।
অসামান্য অশ্রুর গোপন উৎসটি
আজ কেন খুলে যায় উত্তাল সমুদ্রের মতন ?
চোখের জলের মধ্যে ফুটে ওঠে নিজস্ব দর্পণে
তার মুখ, তার মুখ ভালোবাসাহীন
হৃদয়ের কুসুম বৃক্ষে ফোটেনি একটিও ভোরবেলা
অথচ সে পেয়েছে আজন্ম ভালোবাসা ভালোবাসা
শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা মৃত্যুর চেয়েও দীর্ঘ ভালোবাসা
কিন্তু নিতে পারেনি কিছুই .....

মেঘ আর রোদ্দুর রঙে সে দুলতে থাকে
হঠাৎ তখন নাভিমূলে জেগে ওঠে নতুন মাটির গন্ধ
ওকে টানছে রসাতলে, ওকে টানছে ....

স্বাগত প্রণয়

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

অবিরল ভ্রাম্যমাণ
পথের ফেনিল ক্লান্তি ধাবমান মানুষের পায়ে
নিঃসৃত কষ্টের মতো লেগে আছে
ব্যথার-গভীরে-লব্ধ সে বেদনা তবু মানুষের কাছে
চিরন্তন, অমৃতরূপিণী।
স্থবির মৃত্যুর চেয়ে জীবন মহান্
যেন শেষ বিকেলের দিগন্ত আপ্লুত লাল সন্ধ্যা,
যেন মসৃণ ঢেউ তোলা রাত্রির নরম হলুদ বাঁকা চাঁদ।
এরই জন্যে মানুষের এত অনুনয়—এই কি প্রণয় ?
গোপনে গোপনে সংরক্ত অনুভব আরও গাঢ় হয়।
নদীর ওপরে ঝুঁকে থাকা অলস আকাশ
চকিতে সৌন্দর্য আনে বিষণ্ণ মানুষের চোখে
একখানা জলভাঙা মেঘ আর হাওয়ায় ফুলের গন্ধ
তাঁর আশ্চর্য আভাসে
অভিসার বাঁধে নীড় হৃদয়ের খড়কুটো দিয়ে
চুম্বন-ঘন-মুগ্ধতায়
জীবনের এইসব স্বপ্নাতুর ঐশ্বর্যের পাশে
মৃত্যু এসে বারবার তুচ্ছ হোয়ে যায়।

গোপন কাহিনী

মৃদুল দাশগুপ্ত

অক্ষরে অক্ষরে অণু, মানদন্ডে শব্দ দেখি সভ্যতার শুরু থেকে
শুধু অশ্রু অনুমানে নয়।
সমগ্র ধরেছি, ভুল ? তাহলে বিষয় চিনি কতো যে পিচ্ছিল তবু
ভালোবাসি, তুমি ··· তুমি ··· গর্জন তেল মুখে কেন আজও
ছলছল বিজয়া দশমী ?
সিঁড়ির নতুন ঘষে যে সব আদেশে বাঁচে, সেদলেই
উঠি নামি চিরদিন আবর্জনা কোনোভাবে এদেশে উঠি না।
সূর্য সাক্ষী, ক্রমে আরও কালো হবো লাল হয়ে—
ও সবুজ মেয়েটি আমার, সংক্ষিপ্ত পাতায় শুধু
দু-কলম মন্ত্রে শোনো সেই কবে তোমাকেই বিবাহ করেছি

ভালোবাসা পোড়ায়, পোড়ে

ব্রত চক্রবর্তী

ভালোবাসা মন পুড়িয়েছিল।
এখন বাগে পেয়ে চিতার আগুন
শরীর পোড়াচ্ছে।

শরীর পোড়াবার আগুন দাউদাউ জ্বলছে।
কিন্তু যে-আগুন মন পুড়িয়েছিল
সে এখন শ্মশানের এক কোণে
লুটনো শাড়ীর আঁচলে মুখ ঢেকে
ফুলে ফুলে কাঁদছে।

লোকটা, দু-টাকা আগুনের অভিজ্ঞতা যার,
সে যদি একবার মুখ তুলে
ওই রোরুদ্যমানা নারীকে দেখে,
যাবার আগে অন্তত জেনে যেতে পারবে :
ভালোবাসা শুধু পোড়ায় না, পোড়ে নিজেও, নিজেরই আগুনে!

বিবাহ রাত্রি

সুব্রত সরকার

বিবাহ রাত্রির কথা মনে পড়ে ?

তোমাদের কুকুরটিও ঘুমিয়ে পড়েছে ফ্যানের হাওয়ায়।

কুয়োতলার কাছে অর্ধনমিত পতাকার মত কলাপাতা
কিসের শোকপ্রস্তাবে ?

কাল ভোরে আমরা আর কুমার-কুমারী থাকবো না।

তুমি শুয়ে আছো পাশে নদীর মতন
তোমার রক্তের শব্দ শুনতে পাচ্ছি ছলাৎ-ছলাৎ .....

আমি এক গভীর জঙ্গল, ভিতরে কি আছে কে জানে ?

তবু আমাকে ছেড়ে তুমি থাকবে কি করে ?
তবু তোমাকে ছেড়ে আমি থাকবো কি করে ?

কেনায় পুড়েছি আমি

সুবোধ সরকার

আমি ফিরে আসি শেষ রাতে
ঠিক জানি না ফিরেছি কিনা
রাগে দপদপ করে শিরা
পায়ে কোন জোর পাচ্ছিনা।

হাত ময়লা করেছি আমি
হাত নোংরা করেছি আমি
আর নামবো না নীচে ভাবি
তবু মদের গেলাসে নামি।

এক গেলাসে দুজন নামি
বড় গেলাসে দুজন নামি
ওই গেলাস মানে সমাজ
যার ফেনায় পুড়েছি আমি।

কেন মরতে গিয়েছিলাম ?
কেন ডুবতে গিয়েছিলাম ?

ফিরে এসেছি তোমার কাছে
এতো কীট আছে পৃথিবীতে
এতো কেঁচো আছে পায়ে পায়ে
যদি সাবধান করে দিতে
যদি একটু ধরিয়ে দিতে
এতো কাদা লাগতো না গায়ে।

বিষ পেরেকের মতো ঘৃণা
এসো বোলবো না পারছি না
এই পরবাস, অপমান
এর ভেতরেই করি গান।

দুঃখ দিবিনা, আনন্দস্বরূপিনী ?

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কাঙালিনী, তোর মুখের আদলে রানীকে দেখতে শিখে
আমার সাধনা শমিত প্রাত্যহিকে,
দু-চোখে বেদনা, হাতে বরাভয়, আনন্দস্বরূপিনী
এ নারীর কাছে আমি আবাল্য ঋণী—

ঘরে, রাজপথে, দেহে মনে প্রাণে প্রতিদিন কত ক্ষতি
ও প্রাণ প্রতিমা, দিবি না কি সম্মতি
খুঁজে নিতে চাই আলোকপর্ণা সেই গান, অবগাঢ়
গভীর আঁধারে ডুবে যেতে চাই তারও ;
কোথায় ধীবর, দেবেনা ফিরিয়ে সে অঙ্গুরীয়খানি
যে অভিজ্ঞানে চিনেছি রাজাকে, রানী
শোকে তাপে তোর কনকসজ্জা এ জীবনে প্রতিদিনই
দুঃখ দিবি না, আনন্দস্বরূপিনী ?